Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ নূরুল মুত্তাকিন

রোলঃ 23090110106

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ নূরুল মুত্তাকিন

রোলঃ 23090110106

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোহাম্মদ নূরুল মুত্তাকিন, আইডিঃ 23090110106 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও আমাদের জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোহাম্মদ নূরুল মুত্তাকিন

আইডিঃ 23090110106

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা : 5

কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা :...12

মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি:...25

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ও সে মোতাবেক আমল করা :.............................27

ভারসাম্য রক্ষা:...30

হতাশ না হওয়া:..31

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :...60

কুরআন অনুসরণ না করার কুফল :..62

উপসংহার:...65

ভুমিকা :

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবতার মুক্তির সনদ- বিশ্ব জাহানের পথ প্রদর্শক - মহান আল্লাহ পাকের মহান বাণী যা কুল মাখলুকাতের জন্য এক মহা সংবিধান। মানব জীবনের চূড়ান্ত পথ নির্দেশনাসহ সৃষ্টি জগতের জন্য পুংখানুপূংখ এক চুড়ান্ত তথ্য ভান্ডার ও পথ নির্দেশনা যা মানবজাতিসহ সমগ্র সৃষ্টিকূলের কল্যাণে প্রেরিত ও নিবেদিত। আ্ল্লাহ পাকের নিজ ভাষায় – ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট কিতাব যা মানবতার মূক্তিদূত আখেরী পয়গাম্বর আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা(সা) এর উপর নাজিল হয় সৃষ্টিকূলকে অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দিতে, পথহারা কাফেলাকে সঠিক ও কাঙখিত গন্তব্যে পৌছে দিতে। এ গ্রন্থ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎসই নয়,বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবন তথা ব্যক্তিগত,পারিবারিক,সামাজিক,রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সহ বিশ্ব পরিচালনার এক সুস্পষ্ট ও পুর্ণাঙ্গ গাইড লাইন বা পথ নির্দেশনা। কুরআন হচ্ছে স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালা রচিত মহা সংবিধান। যেখানে মানুষের কোন হাত নেই। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ফেরেসতা জিবরাইলের মাধ্যমে বিশ্বনেতা আল্লাহর হাবীর হযরত মোহাম্মদ(সা:) এর নিকট পৌছান এবং পরে পর্যায়ক্রমে আমাদের হাত পর্যন্ত এসে পৌছে। ইহা এমনই এক গ্রন্থ যা সংরক্ষণের দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ নিজেই নিয়ে নিয়েছেন এবং ইহা আল্লাহ কুরআনে ঘোঘনাও দিয়েছেন এভাবে-

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

অর্থাৎ- তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা (সুরা ইউনুস আয়াত -৬৪)।

মানব সৃষ্ট সবকিছুই পরিবর্তনের দাবী রাখে। যেমন মানব সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় সংবিধানে যে রাষ্ট্রগুলো চলে তা সবগুলোই পরিবর্তনশীল। যেমন ধরা যাক- বিশ্বে জ্ঞান গরিমা তথ্য প্রযুক্তির দিক দিয়ে সবোর্চ্চ অবস্থানের দাবীদার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের সংবিধান এ পর্যন্ত ২৭ বার সংশোধন করতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সংশোধন করেছে ৮ বার। আমাদের দেশ বাংলাদেশ এর সংবিধান এ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে ১৭ বার, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত করেছে ১০৬ বার, পাকিস্থান করেছে ২৭ বার,চীন করেছে ৫ বার,ফ্রান্স করেছে-৯ বার,জাপানেও সংশোধেনর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ার রাজনৈতিক দলগুলো সংশোধনে দাবীতে আন্দোলন করছে। সোজা কথা যতই জ্ঞানী আর উন্নত জাতি গোষ্টি হোক কারো পরিকল্পনা পরিপক্ষ ও স্থায়ী নয়। কেবলমাত্র আল্লাহর রচিত সংবিধানই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী । সৌদিআরবে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কোরআনের বিধানে তাই তাদের সংবিধানের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নাই।

অথচ রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্নভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে আসছে । কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহ কতৃক প্রনীত সংবিধান। আমাদের চোখের সামনে এটাই একটা প্রমান যে আল্লাহর প্রণীত সংবিধান স্বয়ংসম্পুর্ন ও অপরিবর্তনযোগ্য।

আমাদের জীবনের সাথে কুরআনের সম্পর্ক এতোই অতোপ্রোত যে কুরআন ছাড়া জীবন পরিচালনা একেবারেই অসম্ভব। বলতে পারেন কুরআন মানেনা এমন মানুষের জীবন কি থেমে যায়? না,থেমে যায় না, সে তার অজান্তেই কুরআনের নির্দেশনা অনুসরন করে থাকে অথবা কুরআন না মানার কারণে জীবনটাকে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ধ্বংস স্তুপের অথল গহীনে চিরতরে হারিয়ে যায়। অর্থহীন জীবনের শেষে যন্ত্রণাময় এক অফুরন্ত ভবিষ্যতের ঠিকানা রচনা করে। কুরআন বহীন জীবনকে তুলনা করা যায় কান্ডারীবিহীন একটি নৌকার সাথে। যেমনটা কান্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতের তোড়ে চলতে চলতে দুমড়ে মোছড়ে এক সময় নদীর গহীনে তলিযে যায় তেমনি কুরআন বহীন জীবনের পরিনতিও ঠিক তেমনটাই হয়। এ দুনিয়ার রীতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো, যে কোন একটি প্রডাক্ট বা মেশিনারীজ তৈরি করার পর এর সুষ্টু রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য একটা মেনুয়েলও তৈরী করা হয়। এ মেনুয়েল দেখে উহার পরিচালনা বা কখনো যান্ত্রিক ক্রুটি দেখা দিলে সারানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর আল্লাহ পাক হচ্ছেন মহা পরিকল্পনাকারী মহাজ্ঞানী তিনি কি এ দুনিয়া – আকাশ বাতাস- গ্রহ নক্ষত্র, নদী নালা পাহাড় পর্বত , মানুষ – জিন্নাত, পশু পাথি সহ সমগ্র সৃস্টির পরে কোন মেনুয়েল ছাড়া আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন? অবশ্যই না, আর সেই মেনুয়েল হচ্ছে পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটা পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আপনার পেশাগত বা অবস্থানগত পরিচয় যাই হউক না কেন আপনার জীনব বা কার্যপরিচলানার যথাযথ ও পুর্ণাঙ্গ নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআন মজিদে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত আমরা এটাকে নেহায়েত তেলাওয়াত আর বিপদগ্রস্ত হলে শিফা গ্রহনের একটা মাধ্যম হিসেবে একে একটা গন্ডীর মধ্যে বন্ধি করে রেখেছি। এর দ্বারা আমরা শুধু কুরআনের প্রকৃত হক্কই নস্ট করছিনা, আমরা চরম দায়িত্ব অবহেলাও করছি। এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে অন্যান্য বই পুস্তকের মত মূল্যায়ন করে আমরা চরম অবজ্ঞা এবং বেআদবীই করছি। আমাদের জ্ঞান যদি না ফিরে আমরা এর জন্য চরম মূল্য ও জবাবদিহীতার মুখামূথী হবে আল্লাহর দরবারে।

আপনি যে পেশার বা অবস্থানের একজন ব্যক্তিই হোন, আপনার জীবন চালানোর দিশা খুজে নিতে হবে পবিত্র কুরআন থেকেই। হতে পারে আপনি একজন কৃষক, সমস্যা নেই, আপনার জীবন বিধান রয়েছে পবিত্র কুরআনে, হতে পারে আপনি একজন ব্যবসায়ী বা একজন শ্রমিক কিংবা ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজীবি, রাস্ট্রীয় আমলা, একজন মন্ত্রী, একজন রাস্ট্র নায়ক অথবা জীবনের তাগিদে নিয়োজিত যেকোন পেশার একজন ব্যক্তি। সমস্যা নেই , আপনার জন্য সঠিক নির্দেশনা হচ্ছে কুরআন। এক কথায় স্থান কাল পাত্র অবস্থান নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সর্বোচ্চ ও পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ধরে নিলাম একজন লোক কৃষক,

তার জন্যও কুরআন নির্দেশনা দেয় ? হ্যা অবশ্যই দেয়, কেননা কুরআন ইহকাল ও পরকালের সকল বিষয় নিয়ে কথা বলে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎ নিয়েই মানুষ ও মানুষের জীবন। চাষাবাদ মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি পেশা। ইসলামে চাষাবাদের গুরত্ব এবং ফজলীত অনেক। তাই এ বিষয়ে একজন কৃষকের দায়িত্ব ও অন্যদের প্রতি তার কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকার অনেক তাগিদ রয়েছে। যেমনটা ধরুন- অন্যের ক্ষেতের সীমানা ঠেলা যাবেনা বা অন্যের ফসল নস্ট করা যাবেনা, কাজে খাটানো শ্রমিকের হক্ব সময় মতো পরিশোধ করে দিতে হবে- এসব বিষয়ে অনেক শিক্ষা কুরআন এবং হাদিসে রয়েছে।

অন্যের সম্পদ দখল করা মানে হচ্ছে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা তৈরী করে নেয়া। রাসূল সা: বলেছেন, কারো এক বিঘত সম্পদ যদি কেউ আত্মসাৎ করে তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তার গলায় সাত স্তবক জমিন ঝুলিয়ে দেবেন। অন্য সাধারণ গুনাহ করলে বা আল্লাহর হকের সাথে জড়িত কোনো হুকুম লঙ্ঘন করলে এত বড় সমস্যা নেই যত বড় সমস্যা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করলে রয়েছে। কারণ এটি বান্দার হক। আর বান্দার হক নষ্ট করলে সেটি আল্লাহ নিজে মাফ করবেন না। কিন্তু আল্লাহর হক নষ্ট করলে চাইলে আল্লাহ মাফও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন।

দুনিয়াতে যদি আপনি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেন, কৌশলে নিজের নামে লিখিয়ে নেন, আইল ঠেলে জায়গা বাড়িয়ে নেন, অন্যের জমির পানি আপনার সুবিধার জন্য কৌশলে চুরি করে নিয়ে নেন.শ্রমিককে কে দিয়ে ক্ষেতে মজুরী খাটিয়ে তাকে তার পাওনা দেননা বা গড়িমসি করেন এগুলো হারাম। এই আত্মসাৎ বা অন্যের হক্ব নষ্ট করা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

রাসূল (সা:) একদিন সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা কি জানো তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে অভাবী?' সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জানি যার সম্পদও নেই টাকাও নেই সে-ই অভাবী। রাসূল সা: বললেন, 'না সে তো সাময়িক সময়ের অভাবী। অভাব দূর হয়ে যেকোনো সময় সে বড়লোক হয়ে যেতে পারে। আসল অভাবী হলো সেই ব্যক্তি যে অনেক নেক আমল করেছে কিন্তু অন্য বান্দার হক নষ্ট করেছে। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ বলবেন, তোমার আমল থেকে দেনা পরিশোধ করো। পরিশোধ করতে করতে আমল শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তার দেনা শোধ হবে না। তখন পাওনাদারের গোনাহ ওই সম্পদ আত্মসাৎকারীর ওপর দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে।'

তেমনিভাবে আপনি যে পেশায়ই আছেন আপনার পেশার সাথে যারা সুবিধাভোগী বা হক্বদার তাদের হক্কের প্রতি ও সতর্ক নজর রাথতে হবে। একজন ডাক্তারের দায়িত্ব সৎভাবে একজন রুগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এতে যদি চিকিৎসক ছলছাতুরি করে অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে এটা হবে তার প্রতি চিকিৎসকের জুলুম। এটা আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। আপনি যদি আইন পেশায় বা বিচারকের পেশায় নিযুক্ত হন, তাহলে আপনার সমস্ত কার্যকলাপ হবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কারো মিথ্যা স্বাক্ষী প্রদান

বা জ্ঞাতসারে মিথ্যা স্বাক্ষী গ্রহন করে ফায়সালা প্রদান করা যাবে না। এখানে ন্যায় নীতি চর্চা না করলে আল্লাহর কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের প্রাপ্য অধিকার রক্ষায় ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচারে সততা রক্ষা না হলে এটা হবে বড় ধরনের জুলুম ও অত্যাচার । এজন্য ইসলামে ন্যায়বিচারকের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। ন্যায়বিচারক দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে সম্মানিত হবেন- হাসরের ময়দানে আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করবেন। ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা ঘুষ গ্রহণ করে অন্যায়ভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে কারো অধিকার খর্ব করা মারাত্মক অপরাধ। এ অন্যায় কাজের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ন্যায়বিচারকারী আল্লাহর নিকটে আরশের ডানে নুরের মিম্বরে অবস্থান করবে। এ অবস্থানে ওইসব লোক থাকবে, যারা নিজের পরিবার এবং নিজের জনগণের প্রতি ইনসাফের সহিত বিচারকার্য সম্পন্ন করে। (মুসলিম : ৪৬০৭)

আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন তাহলে আপনার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা ও সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুখবর। যাঁরা সৎভাবে ব্যবসা করেন, ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ‘সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সত্যবাদী ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১২০৯)। ইসলামে ব্যবসার মূলনীতি হলো সততা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিকতা। এর মানে কারো ক্ষতি না করা, ধোঁকা ও প্রতারণা না করা, ওজনে কম না দেওয়া, মিথ্যা শপথ না করা, অবৈধ পণ্য বা সেবার ব্যবসা না করা (যেমন: মদ, জুয়া, সুদ)।

ব্যবসা যখন আমানতদারি, বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে করা হবে, তখন এটি নেক আমলে পরিণত হবে। কিন্তু কেউ যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে অসততার আশ্রয় নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠরূপে উঠতে হবে। তাই ব্যবসায় সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করা অতীবই জরুরী । মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন অসৎ ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে; তাই ব্যবসায়ে যথার্থ অর্থে সফলতা লাভ তথা দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য কুরআন নির্দেশিত পথেই ব্যবসা করতে হবে। আর জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন ছাড়া বিকল্প নেই।

আপনি যদি একজন শিক্ষক হন তাহলে কুরআনই হচ্ছে আপনার শিক্ষকতা শেখার সর্বোত্তম হাতিয়ার। আর রাসুল (সা) হচ্ছেন আপনার শিক্ষক। মহানবী (সা.) ছিলেন আদর্শ শিক্ষকের উজ্জ্বলতম নমুনা। তাঁকে মানবসভ্যতার শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কোরআন ও হিকমত শিক্ষা দেন । তাই আপনার পেশার সামগ্রীক দিক জানতে আপনাকে কুরআনের কাছে যেতে হবে রাসুল(সা) এর নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আর আপনি যদি একজন ছাত্র বা তালিবুল ইলম হন তাহলে তো আপনি অতি সৌভাগ্যবান। কারণ এ ভাগ্য সকলের হয়না কেবল আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেন তারাই এ সুযোগ লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল করতে পারে। আল্লাহ সুবহানা তা'য়ালা বলেন-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ: 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে।' (সূরা বাকারাহ ২/২৬৯)

আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতাগণ তালেবে ইলমের জন্য নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। আকাশ ও পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য দুয়া করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে-, "যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।" তাই একজন তালেবুল এলেমকে আল্লা্হর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআনের হুকুম আহকাম অনুসরণ করেই খালেস নিয়তে এলেম অর্জন ও চর্চার মাধ্যমে সফলতার পূর্ন স্বাদ লাভ করতে হবে। এতে ব্যথ্যয় ঘটলে ভাল কাজ করেও মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আপনি যদি একজন আলেম হন। নি:সন্দেহে আপনি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। কারণ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া দীনের সঠিক এলেম অর্জন সম্ভব হয়না। আবেদের উপর আলিমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। ওহির মাধ্যমে নবী-রাসুলদের আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। নবী-রাসুলদের সেই ওহির ইলমের উত্তরাধিকারী হলেন আলেমরা। এলেম হচ্ছে নুর আর আলিমরা হচ্ছেন নুরের বাহন, তারাই এ নুরের ঝলকে দুনিয়াবাসীকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করেন এবং এ পথে টিকে থাকার আহবান করেন। এত গুরু দায়িত্ব বহনকারী একজন ব্যক্তি হচ্ছেন আলেম সে হিসেবে তাকে অবশ্যই বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। কুরআন হাদিসের শক্ত অনুসারী হতে হবে তাকে। দুনিয়ার স্বার্থে অথবা খ্যাতি যশের মোহে পড়ে কোনভাবে কুরআন সুন্নার আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয় যাবেনা। সমাজে যার গুরুত্ব যত বেশী তাকে তত বেশী কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয় এটাই স্বাভাবিক। তাই একজন আলেমকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় অনেক সময়। অনেক কঠিন পরীক্ষা তাদের জীবনে আসে। এসব পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত সফলতার প্রত্যাশা করতে হয়।

আলেমের মধ্যে আল্লাহভীতি, ইসলামের সঠিক জ্ঞান, নৈতিকতা, এবং প্রজ্ঞা থাকা উচিত। তাকে অবশ্যই নবী-রাসূলদের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে, যারা সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকেন এবং কোনো ধরনের লোভ বা হিংসা দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধান অনুযায়ী ফতোয়া দিতে হবে এবং হক-এর উপর অবিচল থাকতে হবে।

আপনি যদি একজন রাজনীতিবিদ হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনার জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচানোর জন্য অবশ্যই অবশ্যই কুরআনের শিক্ষা নিতে হবে। কারণ সবগুলো পেশার সাথে একটা বিশেষ জনগোস্টির স্বার্থ জড়িত থাকে কিন্তু রাজনীতি বা রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে পুরো দেশ ও জাতীয় জীবন অতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত থাকে। তাই এ প্লাটফর্মটি যদি কুরআন সুন্নার নীতিতে না চলে তাহলে পুরো জাতি জনপদ হবে বিপথগামী। তাই একজন রাজনীতিবিদকে বা একজন রাষ্ট্রনায়ককে রাষ্ট্র পরিচালনা সহ রাষ্ট্রের সমগ্র বিষয়ে কুরআনে প্রদত্ত নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায়. কোন গুমরাহ নেতার সাথে পুরো জাতি গোষ্টি বিপথগামী এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মহা বিপদের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ.

অর্থাৎ: (হে নবী) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। (সূরা নিসা ৪/১০৫)।

কুরআন যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এ সম্পের্ক আল্লাহ পাক নিজেই বলেন- ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينًاۚ (সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াত)

অর্থাৎ:"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত সম্পূর্ণরূপে তোমাদের ওপর সেরে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম"।এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং এটিই মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান।

জীবন বিধান হিসেব কুরআনই একমাত্র পরম সত্য আর কুরআন ব্যাতিত যত মতবাদ সবই মিথ্যা। মহানবী সা: এর ভাষায়- صدق ينجي، والكذب يهلك সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

পবিত্র কোরআন যেমন পরকালীন জীবনের মুক্তি নিশ্চিত করে তেমনি ইহজগতের সর্বকালীন সর্ব বিষয়ে সুনিশ্চিত কল্যান বিধান করে। এ বক্তব্যের সমর্থেনে কোরআনের এ আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ

-হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

মোট কথা কোরআন ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবন, ইহকালীন জীবন থেকে পরকালীন জীবন, মানুষ জাতি বা জীবকূলের চিকিৎসা বিধান থেকে মহাকাশ গবেষণা, ব্যক্তিগত থেকে নিয়ে সামাজিক রাষ্ট্রীয় এমনকি বৈশ্বিক আইনী সমাধান বিধান – তথা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হেন কোন বিষয় নেই যেখানে কোরআন সঠিক নির্দেশনা দেয় নাই।

কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা :

কুরআনে পাক এমন একটি জ্ঞানের আধার যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সারা জাহানের সমগ্র তথ্য ভান্ডার । মোট ত্রিশ পারায় ছয় হাজার ছয় শত ছেষট্টি টি পবিত্র আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে একেবারে ধ্বংস অবধি এমনকি তারও পবরর্তী অনন্তকালের সামগ্রীক তথ্য ও রহস্য এর মধ্যে অন্তর্নিহিত যা বিশ্বের সকল আশ্চর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য বা মুজেযাও বটে। একে যদি এমন উপমা দেয়া হয় যে, একটি ঝিনুকের মধ্যে সাত সাগর আর তের নদী তথা দুনিয়ার সমগ্র জলরাশি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তাও কিন্তু নেহায়েত কমই হবে। সুতরাং এটাই শুধু অনুধাবন করা যায় যে, কুরআনের ব্যাপকতা অনুমান বা বিশ্লেষণ করা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে এবং সম্পুর্ণই অসম্ভব। এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই রাখেন। অনন্ত অতীত থেকে সীমাহীন ভবিষ্যতের সকল বিষয় এতে সন্নিবেশিত রয়েছে ঠিকই তবে সমসাময়িক এবং সর্বকালের সকল বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণী ও পথ নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। আমাদের কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত বলতে যা রয়েছে তার সবই আল্লার কাছে বর্তমান কারণ আমরা যা করি বা জীবনে যা ঘটেছে বা ঘটছে এবং ঘটবে আল্লাহ সব বিষয়েই পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে যুগে যুগে বা শত সহস্র নিযুত কোটি বছর এবং অনন্তকাল ব্যাপী মানুষসহ সৃষ্টি জগতের যা প্রয়োজন তা নিখুতভাবে কুরআনে সন্নিহিত রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন মোতাবেক এখান থেকে উদঘাটন করে আমাদের তা অনুসরণ করতে হবে। তাই কুরআনের মর্ম অবহিত হয়ে যথাযথ ভাবে এর প্রয়োগের স্বার্থে এ নিয়ে গবেষণা করার বিকল্প নেই। সমূদ্রের বিশাল জলরাশি থেকে প্রয়োজন মোতাবেক পানি আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করলে আপাত দৃষ্টিতে শেষ হবেনা বলে ধারণা করা হলে ও বাস্তবে তা শেষ হয়ে যেতে পারে কারণ এরও একটা সীমা আছে । কিন্ত কোরআন এত সীমাহীন জ্ঞানের আধার তা কখনো শেষ হয়ে যাবে না। কেননা , এটা এমন এক সত্তার মহান বাণী যিনি চিরন্তন, যিনি সর্বকালীন - যিনি অনন্ত , যিনি অসীম। এমন মহান আল্লাহর বাণী কোরআন যা থেকে অনন্তকাল ধরে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করলেও এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে না বা এর সমগ্র রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে না। আমাদের সমসাময়িক প্রয়োজনে এ থেকে ফায়দা নিতে হবে। আর এর থেকে যথার্থ ফায়দা হাসিলে এটি নিয়ে গবেষণা বা ঘাটাঘাটির কোন বিকল্প নেই। কুরআন নাজিলের প্রাক্কালে আল্লাহপাকের প্রথম বাণী ছিল -اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অধ্যয়ন গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

কুরআন নিয়ে গবেষণার সামগ্রীক প্রয়োজনীয়তা এক নজরে আলোকপাত করা হলে ও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার দাবী রাখে । কেননা এতো বিশাল একটা বিষয়ে নিছক কয়েকটা

বাক্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলা অসাধ্যই বলা যায়। তাই কুরআন কেন বিশদ গবেষণার দাবী রাখে এ নিম্নে কিছু ধাপে এ বিষয়ে আলোকপাত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো :

ক) সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে চেনা : মহান আল্লাহ পাকের পরিচয় ও অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে পবিত্র কোরআনে বর্নিত সৃস্টি কৌশল ও সৃষ্টির বৈচিত্র অবলোকনই যথেষ্ট। স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার কর্মনিপুনতা ফুটে উঠে তার সৃষ্টির সুনিপুন গঠন ও সুশৃংখল কার্য পরিক্রমায়।আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টি রহস্য তুলে ধরেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক পৃথিবী ,চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ -উপগ্রহ আকাশ মহাকাশ ,নদী- সাগর,পাহাড় -পর্বত তথা সমগ্র দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টির রহস্য ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার কৌশল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। কোরআনে বর্নিত এসব কর্মকৌশল পর্যালোচনা করলে আল্লাহ ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। যে ব্যক্তিই সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে সেই বুঝতে পারে যে একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহ অবশ্যই আছেন যিনি সবকিছুকে টিকিয়ে রাখেন, সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সবকিছু তারই ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত নিয়ম ও বিধিমতে ঘটে। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন- ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।" (৫৫-সূরা আর রাহমানঃ আয়াত-৫)।

আল্লাহ আরো বলেন-

لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

অর্থাৎ: "সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রের নাগাল পায় আর রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে।" (৩৬-সূরা ইয়াসিনঃ আয়াত-৪০)

আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিক্রমার কৌশল নিয়ে আবিরাম গবেষণা হচ্ছে ও বিভিন্ন তথ্য আবিস্কৃত হচ্ছে। কিন্ত এসব তথ্য মহান আল্লাহ আগে থেকেই কুরআনে বর্নণা করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করতোনা নিজেদেরকে জ্ঞান গরিমায় আকাশচুম্বী মনে করত তারাই সারা জীবন গবেষণা করে শেষমেশ কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বাণীর সাথে একমত পোষণ করে নিজের জ্ঞান গরিমাকে নিজেই অসার প্রমান করেছে। মহান আল্লাহই যে সর্বজ্ঞানী আর কুরআনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সেকথা তারাই প্রমান এবং স্বীকার করছে।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আইনস্টাইন বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্ব জগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝতে পারে যে, যে সত্তা একে সৃষ্টি করেছেন তিনি মহাজ্ঞানী এবং তিনি ঘুঁটি দিয়ে জুয়া-পাশা খেলছেন না।

ফরাসি চিকিৎসাবিদ Dr. Maurice Bucaille তার রচিত The Bible The Quran and Science বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন- 'কুরআনে এমন একটি বক্তব্য নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক বা সাংঘর্ষিক'। কুরআনের বৈচিত্র ও ব্যাপকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'কুরআনকে বিজ্ঞানীদের জন্য বিজ্ঞানের একটি একাডেমী,

অভিধানবেত্তাদের জন্য একটি অভিধান, ব্যাকরণবিদদের জন্য একটি ব্যাকরণের বই, কবিদের জন্য একটি ছন্দময় বই এবং আইনের এনসাইক্লোপিডিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে'।

শিখ ধর্মের প্রবক্তা এবং প্রথম গুরু Gurū Nānak বলেন, 'বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ'(তথ্যসূত্র-মাসিক আল ইখলাছ-এপ্রিল ২০২২ সংখ্যা) ।

ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক Napoleon Bonaparte বলেন, 'আমি আশা করি এমন একটি সময় বেশি দূরে নয় যখন আমি সকল দেশের বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারব এমন একটি একক শাসক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, যা কেবল আল-কুরআনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ হল, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য এবং মানুষকে সুখ এবং শান্তির পথে পরিচালিত করে'।

মহান আল্লাহর শান বুঝতে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণার চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে। আল্লাহর সৃষ্টির নিপুণতা দেখেই আল্লাহর মহিমা অনুধাবন করা যায়। তাই যুগ যুগ ধরে গবেষক ও জ্ঞানীরা আল্লাহ এবং কুরআনের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছে। আর জ্ঞান সাধনা যতই চলবে মানুষের অন্তচক্ষু ততই প্রস্ফুটিত হবে। মনের অন্ধকার দুর হবে। প্রকৃত সত্য চিনতে পারবে। গবেষনা আর চিন্তার অফুরন্ত খোরাক পবিত্র কুরআনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই তার অস্তিত্ব আর মূল্য অনুধানক করতে পারবে। অন্ধ আর জাহেলরা এর মর্ম কখনো উদ্ধার করতে পারবেনা। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা মূলকের ৩- ৪ আয়াতে বলেন-

الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

অর্থাৎ - " তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে "। মহান আল্লাহপাক নিজের অস্থিত্বের নিদর্শনস্বরুপ আল্লাহ তার বিভিন্ন সৃষ্টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সুরা কাফ এর ৬নং আয়াতে আল্লাহ বিস্ময় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ মহাকাশ দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন বলেন-

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

অর্থাৎ- 'তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই?'একই সুরায় ৭ নং আয়াতেই আল্লাহ ভূ-মণ্ডলকে প্রীতিকর আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ অর্থাৎ 'আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

আল্লাহ গ্রহ-নক্ষত্রের সৌন্দর্যের প্রতি মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ 'আমি আকাশ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য' (সুরা : হিজর, আয়াত : ১৬)।

কোরআনে বৃক্ষ-তরুলতা ও মনোরম উদ্যানের কথা বলা হয়েছে এভাবে- أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ, অর্থাৎ বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায় (সূরা নামল: ৬০)।

আল্লাহ পাক তার সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েই থেমে যান নি তার সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করতে ও তা থেকে আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে ধারনা নিতে উৎসাহিত করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহ বান্দাকে তার কার্যপরিক্রমা সম্পর্কে ধারণা দিতে গোধূলিলগ্নের সৌন্দর্য তুলে ধরে বলেছেন, وَ لَكُمۡ فِيۡهَا جَمَالٌ حِيۡنَ تُرِيۡحُوۡنَ وَ حِيۡنَ تَسۡرَحُوۡنَ অর্থাৎ "এবং তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আসো এবং সকালে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো"। (সুরা : নাহল, আয়াত : ৬)।

আল্লাহপাক তার সৃষ্টির বিশদ বর্ণনা দিতে তুচ্ছাতিচ্ছ বিষয় থেকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সব বিষয়ে কুরআনে আলোকপাত করেছেন। সুরা ফাতিরের ২৭ নং আয়াতে তিনি এমনিভাবে বর্ণনা করেন-

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهَا ؕ وَ مِنَ الۡجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيۡضٌ وَّ حُمۡرٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهَا وَ غَرَابِيۡبُ سُوۡدٌ

অর্থাৎ: তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তা দিয়ে রং বেরংয়ের ফলমূল উদগত করি। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল আর নিকষ কালো।

আল্লাহপাক প্রাণিজগৎ সম্পর্কে উদাসীন নয়। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে খুজে পাওয়া যায় আল্লাহ সৃষ্টি নিপুনতার পরিচয়। আল্লাহ প্রাণিজগতের বিস্ময়কর জীবনধারার প্রতি মুমিনকে দৃষ্টিপাতের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন- أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, 'তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?' (সুরা : গাশিয়া, আয়াত : ১৭)।

মানুষকে আল্লাহপাক সৃষ্টিকরেছের তার ইবাদতের জন্য আর বাকি সব সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশাল প্রাণী জগৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন স্ব স্ব পরিবেশ পরিস্থিতে টিকে থেকে মানুষের খেদমত করে যাওয়ার জন্য। উট হচ্ছে তেমনই একটি প্রাণী। ধু ধু মরু ভুমিতে যখন কোন বাহন ছিলনা থাকলেও মরুভুমিতে চলার মতো উপযোগীতা ছিলনা । তখন মানুষের প্রয়োজন মিটাতে উটই ছিল একমাত্র বাহন। তার গঠন প্রকৃতি যেন এমনই যেন সে

পরিবেশের সাথে একবারে খাপ খাইয়ে ঠিক পরিকল্পনা মতো বানানো হয়েছে। ইহা আল্লাহর এক বিষ্ময়কর সৃষ্টি। এটি ৫৩ ডিগ্রি গরম এবং -১ ডিগ্রি শীতে টিকে থাকে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাটতে পারে। কোনো পানি পান না করে মাসের পর মাস চলতে পারে। কোথাও পানি পেয়ে গেলে একসাথে বিশাল পরিমানের পানি পান করে কয়েক মাসের জন্য তা মজুত করে রাখে যেন বিশাল মরুপ্রান্তরে পানির জন্য কষ্ট করতে না হয়। মরুভূমির বড় বড় কাঁটাসহ ক্যাকটাস খেয়ে ফেলে। দেড়শ কেজি ওজন পিঠে নিয়ে শত মাইল হেঁটে পার হয়।

মহান আল্লাহকে চেনার জন্য কারো আকাশ -মহাকাশ বা পাতাল -সমূদ্র দেখার যার সুযোগ নেই তার জন্য তার নিজের সাড়ে তিন হাত শরীর ও এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পর্যবেক্ষন করলেই আল্লাহ অস্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

জ্ঞানসমৃদ্ধ পূর্ণ ঈমান দীপ্ত মানুষ অবশ্যই নিজের শারীরিক গঠন এর বিকাশ এবং এর কার্য নৈপুণ্যতা নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে ।

’ আল্লাহ পাক বলেন –

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ-وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থঃ”বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে, এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?”

আমরা নিজের কথা চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে পারি। আমার নিজের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে ছিলনা এখন আমি আছি আর যেকোনো সময় আমি আর থাকবোনা। আমার যে শরীর এর উপর কি আমার কোন নিয়ন্ত্রণ আছে। আমার গঠন ও দেহ সৌষ্ঠবের উপর আমার কি কোন নিয়ন্ত্রন আছে। অবশ্যই নাই, যদি থাকতো তাহলে আমার গঠন রং রুপ আমার মতো করে তৈরী নিতাম। আল্লাহ যেভাবে খুশী সেভাবেই আমাকে তৈরী করেছেন। আর আমার শরীরের সমগ্র কার্যপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে। আমার দেহের গঠনপ্রণালী চিন্তা করলে তো আরো বিস্মিত হই।

অপার রহস্যে ঘেরা মানবদেহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা কি নিজেদের নিয়ে ভাববে (চিন্তা-গবেষণা) না?’(সুরা জারিয়াত, আয়াত : ২১) আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণায় মানবদেহের বিস্ময়কর সব রহস্য বের হয়ে আসছে, যা বিবেকবান মানুষকে আল্লাহর পথেই ধাবিত করে, তাঁর পরিচয় লাভে সাহায্য করে। পবিত্র কোরআনেও মানবদেহের প্রায় ২৭টি অঙ্গের আলোচনা এসেছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি অঙ্গের আলোচনা সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করা হলো ।

মুখমণ্ডল: আল্লাহপাক মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এ সৌন্দর্যের বহি:প্রকাশ প্রধানত মুখের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। মুখ মন্ডলের সৌন্দর্যের নিরিখেই মূলত মানুষের সৌন্দর্য নিরুপিত হয় এবং এ মূখ মন্ডলের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। মূখ মন্ডলকে সুশ্রী করে তুলার জন্য আল্লাহপাক বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সুনিপুনভাবে স্থাপন

করেছেন। যদি এর কোন ব্যত্যয় ঘটতো তাহলে কি বিশ্রীই না লাগতো আমাদের। প্রতিটি ইন্দ্রিয় জোড়ায় জোড়ায় তৈরী করেছেন এবং অত্যন্ত সুশ্রীভাবে স্থাপন করেছেন। সুন্দর করে দুইটি চুখ না দিয়ে যদি এক চুখ দিয়ে দিতেন , দুইটি কান না দিয়ে যদি একটি দিয়ে দিতেন, নাকের সুন্দর একটা আকৃতি না দিয়ে যদি শুধু শ্বাস নেয়ার জন্য একটা ছিদ্র দিয়ে রেখে দিতেন তাহলে কেমন লাগতো আমাদের? আল্লাহর দেয়া অগনিত খাবারের স্বাদ নেয়ার জন্য মুখের মধ্যে একটি মাংস পিন্ড দিয়ে রেখেছেন যেটা আমাদের জিহ্বা। এর মধ্যে দিয়ে রেখেছেন তিতা,মিঠা,নোনতা ইত্যাদি সব স্বাদ নেয়ার ক্ষমতা। এ মাংস পিন্ড থেকে আবার নি:সৃত করেন লালা যা আমাদের মুখ ও গলা সব সময় তাজা রাখে এবং ভক্ষণকৃত খাবার হজমের জন্য এ থেকে নি:সৃত হয় এক ধরনের রস বা এনজাইম। এ এনজাইম রস বা লালা কোথা থেকে আসে বিজ্ঞানীদের আজো ধারণার বাহিরে। একমাত্র আল্লাহই জানেন কোখায় এর উৎস। খাদ্য চর্বনের জন্য মুখের ভিতরে দিয়ে রেখেছেন অনেকগুলো দাঁত। এ দাঁতগুলো দিয়ে সারা জীবন খাদ্য চর্বন করতে হয় তাই এ দাতগুলো নবায়ন করে দ্বিতীয়বার আবার দাত গজানোর ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে সারা জীবন অনায়াসে কাজ চালিয়ে নেয়া যায়।

মুখমন্ডলের মধ্যে যে চক্ষুযোগল রয়েছে তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মহান আল্লাহ এগুলোর সুরক্ষার জন্য এগুলোকে কুটরির মধ্যে স্থান দিয়েছেন। অধিক আলো ও ধুলাবালি প্রতিরোধের জন্য এর উপরে ভ্রু দিয়ে এগুলোকে সুরক্ষিত করেছেন। শরীরের অন্য অংশের চুল অবিরত বর্ধনশীল হলেও এ ভ্রু এর চুল বর্ধনশীল নয়। কি বিরাট সৃষ্টি কৌশল এর মধ্যে বিদ্যমান।

মস্তিষ্ক: মস্তিস্ক হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ।এ মস্তিষ্ক বা ব্রেন আল্লাহ পাক সুরক্ষিত করেছেন মানুষের শক্ত খুলিযুক্ত মাথার মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গায়।মস্তিষ্ক হচ্ছে মানবদেহের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এখান থেকেই গোটা মানবদেহ নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালিত হয়।এটি অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গ যার গঠনপ্রনালী ও কার্যক্ষমতা অবাক করার মতো। মানুষের মস্তিষ্কে আছে ১০০ বিলিয়নেরও বেশি নিউরন বা নার্ভ সেল। একটি গমের দানার সমপরিমাণ মস্তিষ্ক টিস্যুতে এক লাখের মতো নিউরন থাকে, যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে এক বিলিয়ন বন্ধন তৈরি করে। মস্তিষ্কে প্রায় ১০ হাজার রকমের নিউরন রয়েছে। মস্তিষ্কের আদেশ এসব নিউরনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আকারে পৌঁছে। এসব তরঙ্গের গতি ঘণ্টায় ৪০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি। প্রতিদিন মস্তিষ্কে ১২ থেকে ২৫ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।আর শরীরের যেকোনো অঙ্গের চেয়ে মস্তিষ্কে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা শরীরের প্রয়োজনে যে খাবার খাই,তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই খরচ হয় মস্তিষ্কের শক্তি উৎপাদনের পেছনে। মস্তিষ্কের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ তাতে একটি পর্দা দিয়েছেন; যার নাম ব্লাড-ব্রেইন-ব্যারিয়ার। রক্ত থেকে মস্তিষ্কে কী যাবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে এই পর্দা। ক্ষতিকর পদার্থ এই পর্দা ভেদ করে সাধারণত যেতে পারে না। তবে নিকোটিন কিংবা অ্যালকোহলকে বাধা দিতে পারে

না সে। হয়তো এ কারণেই মহান আল্লাহ মদ, অ্যালকোহলসহ সব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকারক জিনিস হারাম করেছেন।

আজকাল সবচেয়ে আলোচিত ও বিজ্ঞানের শক্তিশালী আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার । শক্তিশালী একটি সুপার কম্পিউটারের মেমোরির ধারন ক্ষমতা হচ্ছে ২০০/৩০০ গিগাবাইট। অন্যদিকে, মানুষের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা কমপক্ষে ২.৫ পেটাবাইট অথবা ১ মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ গিগাবাইট। মানুষের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা একটা সুপার কম্পিউটারের তুলনায় কত গুন বেশী তা কি আশ্চর্য করার মতো নয়? আর হবে না কেন আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ তৈরী করেছে কম্পিউটার আর মানুষের ব্রেইন তৈরী করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মানুষ যদি তার জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতো তাহলে মেধাহীনতা আর অকর্মন্যতা বলতে আর কোন শব্দই থাকতো না। জ্ঞান বিজ্ঞানে মানবজাতি উন্নতির অনেক উচচশিখরে অবস্থান করতো।মানুষকে আল্লা্হপাক কি পরিমান জ্ঞান দান করেছেন সে ধারনা না থাকায় আল্লাহর দেয়া এ নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার হচ্ছেনা। আর অব্যবহৃত এ জ্ঞান এর মতো গুপ্তভান্ডার হতে কোন উপকার মানবতাকে না দিতে পারলে এ বিরাট প্রাপ্তির অপচয়ই করা হলো যা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়ই বটে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের যদি সঠিক ব্যবহার হতো তাহলে আজ ঘরে ঘরে জাবের ইবনে হাইয়ান,ইবনে সিনা, ইবনুন নাফিস, আল খাওয়রিজমি,আল ফারাবি, আল গাজ্জালী এর মতো বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এর জন্ম হতো। জ্ঞান বিজ্ঞানের জয় জয়কারের সাথে মানুষজন সহজে আল্লাহর মহানত্ব সম্পর্কে প্রকৃত ধারনা লাভ করতে পারতো।

হৃৎপিণ্ড (কলব): মানবদেহের সৃষ্টিকৌশল এক মহা কর্মযজ্ঞের নিদর্শন। মানুষের প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে মহান আল্লাহর অশেষ কর্মকৌশল ও হেকমতের বহিপ্রকাশ। আর মানুষের হৃৎপিন্ড যেন এক আল্লাহর অস্তিত্ব জানান দেয়ার এক বিরামহীন কর্মপরিক্রমা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক মূহুর্তের জন্য ও এর স্পন্দন বন্ধ হয় না। এমনকি শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী অংগ বলে পরিচিত মানুষের ব্রেনও ক্লান্ত হয় শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু হৃৎপিন্ড এর কোন ক্লান্তি নেই ,শ্রান্তি নেই বা ঘুমিয়েও পড়েনা। জন্ম খেকে মৃত্যৃ পর্যন্ত প্রতিটি মূহুর্তে অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছে। প্রতিটি মুহুর্তে স্পন্দিত হচ্ছে, অত্যন্ত সুনির্ধারিত নিয়মে শরীরে রক্ত সঞ্চালনের কাজ করে যাচ্ছে। সাথে সাথে মস্তিষ্কের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে যেন সারা শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ সমূহের অভিভাবকত্ব করে যাচ্ছে। কিভাবে এমন সুশৃঙ্খল কাজ স্বয়ংক্রীয়ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা সত্যিই বিশ্বয়কর। এ যেন নিজের অজান্তেই কারো আদেশ পালন করছে এ অঙ্গটি । আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর আদেশ।

পবিত্র কোরআনের ১৩২টি আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কলব শব্দটি এসেছে। মূলত কলব মানে মন। একে বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব হলেও প্রিয় নবী (সা.) মানবদেহের একটি অঙ্গকে কলব বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সেই অঙ্গটিই হলো হৃৎপিণ্ড। রাসুল (সা.)

ইরশাদ করেন, জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেই গোশতের টুকরাটি হলো অন্তর (বুখারি, হাদিস : ৫২)। ইহা মূলত: একটি পেশিবহুল অঙ্গ যা পৌনঃপুনিক ছান্দিক সংকোচনের মাধ্যমে রক্তনালির ভেতর দিয়ে রক্ত সারা দেহে প্রবাহিত করে। একটি মানব হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়, সে হিসাবে ৬৬ বছরের জীবনে এটি প্রায় ২.৫ বিলিয়নবার স্পন্দিত হয়। এটি মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেখানে কোনো সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়বে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও। যেমন—উচ্চ রক্তচাপ থাকলে কিডনির রোগ কিংবা ডিমেনশিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

তাছাড়া, আরো একটি লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যে, পুরুষের পায়ের টাখনুতে রয়েছে মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন। পায়ের টাখনুতে রয়েছে টেস্টোস্টেরন নামক যৌন হরমোন, যা সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রয়োজন। এটিকে ঢেকে রাখলে টেস্টোস্টেরন নামক যৌন হরমোন শুকিয়ে যায়। আর হয়তো এ কারণেই রাসুল (সা.) বিভিন্ন হাদিসে টাখনুর নিচে কাপড় পরাকে নিষিদ্ধ করেছেন। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,'যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের পোশাক (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। (বুখারি, হাদিস : ৫৭৮৮)।

মানবশরীরে হাতের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য । হাতের আঙুলের ডগায় শরীরের সব স্নায়ুর শেষ প্রান্ত এসে ঘনসন্নিবেশিত হয়েছে, যা পরিবেশের উদ্দীপনা দ্রুত গ্রহণে ও সাড়া প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। হাতের আঙুলের মধ্যেও মহান আল্লাহ তাঁর অসীম শক্তির চিহ্ন রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'হ্যাঁ, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ' (সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ৪) মহান আল্লাহ ওই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের আঙুলের অগ্রভাগে তিনি সূক্ষ্ম কোনো রহস্য রেখেছেন, যা তিনি মানুষের পুনরুত্থানের সময়ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। তা হলো আঙুলের ছাপ।

১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ট এক গবেষণায় আবিষ্কার করেন, পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যার আঙুলের ছাপ অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে হুবহু মিলে যবে। প্রত্যেক মানুষকে শনাক্ত করার জন্য তার আঙুলের ছাপই যথেষ্ট। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অপরাধী শনাক্ত হয়ে যায় হাতের এই আঙুলের ছাপের মাধ্যমেই। অনেকটা হাতের ছাপই বলে দেয়, অপরাধী কে হতে পারে। আজকে আমরা আধুনিক সব আবিস্কার নিয়ে অনেক সময় আশ্চর্য হই কিন্তু আল্লাহর এ বিস্ময়কর সৃস্টি নিয়ে কি আমরা ভাবি ?

আল – কুরআন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল লোকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, 'একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে যেমন অসংখ্য প্রমাণ তেমনি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অনেক নির্দেশনা । তারপরেও কি তোমরা তা দেখবে না?

খ) নিজেকে চেনা:

মহান আল্লাহকে চেনার জন্য নিজেকে চেনাই যথেষ্ট। আজকের আমি তো এমন আমি ছিলাম না। কোন অস্তিত্ত না থাকা থেকেই আজ আমার এ অস্তিত্ব। এক সময় কথা বলতে না পারা সেই ব্যক্তিই আজ বীর দর্পে বক্তব্য দিয়ে বিশ্ব কাপাই, এক কদম হাটতে না পারা সেই আমিই আজ বিশ্বচরাচরে দাপিয়ে বেড়াই। নিজের নিয়ন্ত্রন নিজে করতে না পারা সেই আমি আজ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেই। কোথা থেকে পেলাম এ শক্তি, কে দিল আমাকে এ যোগ্যতা কখনোকি ভেবেছি ? এ ভাবনার চূড়ান্ত জবাব হবে -আমি নিজে নিজে কিছুই করিনি কেউ আমাকে করিয়েছে। আর কে সেই স্বত্ত্বা। ভাবলেই বুঝা সহজ যে, সে স্বত্ত্বা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলেন- নিজেকে জানা হলো জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ।

যে নিজেকে চিনেছে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকেও চিনেছে। যে সৃষ্টিকর্তাকে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান করেছে সে নিজেকেই অনুসন্ধান করেছে। Know thyself 'নিজেকে জানো' বলে সক্রেটিসের আরো একটি উক্তি রয়েছে। আমাদের মহানবী(সা:)ও বলেছেন, নিজের মধ্যে তোমার প্রভুকে সন্ধান কর। ইসলামের সূফীবাদের মূল কথাতো নিজের মধ্যে আল্লাহকে আবিষ্কার করা। অর্থাৎ নিজের গঠন প্রকৃতি, সৃস্টি কৌশল, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন কার্যপ্রনালী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করলে এ ধারণা সহজেই জন্মায় যে এ মহা কর্মযজ্ঞ মহান স্বত্ত্বা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।

গ) সৃষ্টি জগত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ:

সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে বিজ্ঞান এবং ধর্ম এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাজাগতিক বিয়ষ এবং জৈবিক বিবর্তন সম্পর্কে জানা যায়। অন্যদিকে, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায়। সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

আজকাল জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে কিছু বিভ্রান্ত মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিছু জ্ঞানপাপী নেতিবাচক ও মনগড়া মতবাদ প্রচার ও ব্যাখা করে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর শানের সাথে বেআদবী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। কুরআনের সঠিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষার জন্য কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষনা এবং লব্দ জ্ঞানের প্রয়োগের বিকল্প নেই। নিম্নে এ ধরনের কিছু প্রসঙ্গিক বিষয়ে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

বিবর্তনবাদ: বিবর্তনবাদ অনুসারে, মানুষ কোনো একক প্রাণী থেকে সরাসরি সৃষ্টি হয়নি,বরং একটি দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসেছে। আধুনিক মানুষ নাকি হাজার হাজার বছরে বিবর্তিত বানরের আধুনিক রুপ, মূলত মানুষ জন্মগতভাবে বানর বা শিম্পানিজ ছিল। কি হাস্যকর তাদের উপস্থাপনা। এখানে প্রশ্ন হলো, সমসাময়িক কিংবা গত শত সহস্র বছরের ইতিহাসে এমন কোন নাজির কি রয়েছে যে একটি বানর বা শিম্পাঞ্জি মানুষে পরিনত হয়ে

জীবন যাপন করতে শুরু করেছে এবং কোন নির্দিস্ট সম্প্রদায় সে গোষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তারা কি জানে কে ছিল বানর থেকে জন্ম নেয়া প্রথম মানুষ এবং তাদের পরবর্তী বংশধারা কি। কিছুই নেই সবই কল্পনাপ্রসূত এক গাজাখুরি গল্পমাত্র। অথচ মানুষ সৃষ্টি ইতিহাস ঘাটলে আদম (আ:) এর জন্ম থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত একটি স্পস্ট বংশপরিক্রমার চিত্র পাওয়া যায় এবং এটাই মানবজাতির মূল ইতিহাস। বিবর্তনবাদিদের উপস্থাপনা মূলত উদ্ভট ও তাগুতি চিন্তার ফলশ্রুতি। তারা কি সেকথা জানে যে মানুষের পূর্বসুরী সে বানর আসলো কোথা থেকে বা ওটাকে সৃষ্টি করলোইবা কে। নিশ্চয়ই সেই বানরকে কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে। আর যদি এমনই হয় তাহলে উনি বানর সৃষ্টি না করে সরাসরি মানুষ সৃষ্টি করলেই অসুবিধাটা কি ছিল। বানর সৃষ্টি করতে পারলে তো সরাসরি মানুষই সৃষ্টি করতে পারতেন। আসলে বিবর্তনবাদি জ্ঞানপাপীরা ইবলিসেরই বংশধর, আর ইবলিস তো আদমকে জন্ম লগ্ন থেকে লাঞ্চিত করার পায়তারা করে আসছে। আজও তার উত্তরসুরীরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরন করছে।

বিবর্তনবাদের ধারনা বস্তুবাদীদের এক উদ্ভট , ভ্রান্ত ও কল্পনাপ্রসূত দাবী। ইহা তাদের বিকৃত মানসিকতা ও তাগুতি চিন্তা ও অতি স্বল্প জ্ঞানের পরিচয়ই বহন করে।আল্লাহপাক কুরআনে বলেন- وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ-তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যমাত্র। আর অল্প জ্ঞান নিয়ে যখন নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবা হয় তখন এ ধরনের বিড়ম্বনাই ঘটে থাকে।

আল্লাহ পাক মানুষ সৃস্টির বৃত্তান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন- خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ- عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ (সুরা আর রাহমান আয়াত ৩-৪) । অর্থাৎ -তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ- তিনিই তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।

এ বায়ান বা কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণার অভাবে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আজ কিছু মানুষ নিজেকে বানরের বংশধর হিসেবে গন্য করছে। কুরআনের জ্ঞান থেকে দুরে থাকার কারণে আজ মনগড়া ও হাস্যকর চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে। আল্লাহপাক কুরআনেই বলেছেন- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ -অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে -অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি । এখানে স্বয়ং কিছু কলঙ্কিত আদম সন্তান তাদের এ ধারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে হীনতাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করছে। তারা আসলে অভিশপ্ত শয়তানেরই দোসর। তারা আসলেই অজ্ঞ।

আদি মানব কী বস্তু থেকে সৃষ্টি তা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে ‘কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা’ (সুরা সাজদাহ, আয়াত : ৭)। অন্য আয়াতে এসেছে ‘আমি মানবকে বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি’ (সুরা হিজর, আয়াত : ২৬)। অন্য জায়গায় এসেছে, ‘পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মাটি থেকে (মানুষকে) সৃষ্টি করেছি’ (সুরা আর-রহমান, আয়াত : ১৪) । আদম (আ.) মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি কিন্তু মা হাওয়া (আ.) কী দিয়ে সৃষ্টি সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ‘অতঃপর তিনি তার (আদম)

থেকে তার যুগল (হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন' (সুরা জুমার, আয়াত : ৬)। আরো ইরশাদ হয়েছে 'তিনি তার (আদম) থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দুইজন থেকে অগণিত নারী-পুরুষ।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১)। মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হলো তিনি তাকে বিশেষ দেহ-কাঠামো দান করেছেন। সুন্দর চেহারা, সুষম দেহ, উপযুক্ত প্রকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব আল্লাহর বিশেষ দান। ইরশাদ হয়েছে 'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।' (সুরা ত্বিন, আয়াত : ৪)। উপরের আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মহান স্রষ্টা মানুষের দৈহিক কাঠামো অন্যান্য প্রাণীর মত সৃষ্টি করলেও তার আত্মিক বিবর্ধন করেছেন ভিন্ন ভাবে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কর্দমাক্ত মাটি থেকে, অর্থাৎ মানুষের আর এন এ/ ডি এন এ সৃষ্টি করা হয়েছে কর্দমাক্ত মাটির বিভিন্ন উপাদান থেকে যা আজকের বিজ্ঞান পরিক্ষিতভাবে প্রমান করেছে। অন্যান্য প্রাণীর বেলায়ও তাই ঘটেছে; নীচের আয়াতটিতে এমনটাই বুঝা যায়;

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অথাৎ- আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম (সূরা আন নুর আয়াত ৪৫)

আজকাল কিছু জ্ঞানপাপী অধিকতর বিজ্ঞান ও বস্তু নির্ভর হয়ে পড়ায় নানাবিধ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কুরআন সেই আল্লাহ পাকেরই বাণী যিনি সর্বময় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। আর বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের সীমিত চিন্তা প্রসুত খুব সামান্যই জ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কুরআন দিয়ে যাচাই করে নিতে হয়। কুরআনকে বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করা একটা দু:সাহসেরই নামান্তর। বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়। আজ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আসছে, কাল তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবার বহু বিষয়ে খোদ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই মতভেদ আছে। কিন্তু কুরআনের বাণী চিরন্তন। এর কোন পরিবর্তন নেই। এর মর্মবাণীর কোন ব্যত্যয় কখনো ঘটেনা। এসকল বাস্তবতা সামনে রেখেই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করতে হবে। আর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ চিন্তা প্রসূত বিজ্ঞানের সঠিক সিদ্ধান্ত কখনো কুরআনের বর্ণনার বিরোধী হতে পারে না।

মহাজাগতিক সৃষ্টি:

মহাজাগতিক সৃষ্টি বলতে মূলত মহাবিশ্বের উৎপত্তি বোঝানো হয়, যা বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে একটি অতি ঘন এবং উত্তপ্ত বিন্দু থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকে এটি প্রসারিত হচ্ছে। মহাজাগতিক সৃষ্টি একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং এর মধ্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ এবং প্রাণের উদ্ভবও অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের এই সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকারী মালিক। সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য রেখেছেন গবেষণা,জ্ঞানার্জন,আবিষ্কার,গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও ইবাদতের বহু উপকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الۡاَلۡبَابِ অর্থাৎ- নিশ্চয় আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা আল ইমরান : ১৯০)।

পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যখ্যা করে তথাকথিত মুক্তমণা নাস্তিকরা তাদের মনগড়া মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ আগে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তারপর মহাকাশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে, বিগ ব্যাং এর পরে পুরো মহাবিশ্ব ধোঁয়া'র মতো ছিলো। এরপর সেই ধোঁয়া থেকে নক্ষত্র তৈরি হয়, এবং সর্বশেষ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখানে শুধু সৃষ্টিকে দেখেছে, স্রষ্টার বিষয় তাদের নজরে আসে নাই বা কৌশলে এড়িয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর উঠেছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এমনভাবে যে, রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে তড়িৎ গতিতে। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো! সৃষ্টির একমাত্র কর্তা আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়' *(আল-আ'রাফ আয়াত ৫৪)*।

আল কুরআনের সুরা আম্বিয়ায় মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সত্য ও প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে, যাকে পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞান সত্য বলে স্বীকার করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ, حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ'আর তারা কি দেখে না যে, আসমান ও জমিন বন্ধ অবস্থায় ছিল, অতঃপর আমি তা উন্মুক্ত করেছি!।' (সুরা আম্বিয়া : ৩০)। পরবর্তীতে বহু গবেষণার পর **১৯৬০** সালে কুরআনে বর্ণিত এ মহাজাগতিক ঘটনাটি আবিষ্কৃত হয়।

মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণ তথাকথিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগোষ্টি অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। যে মহান আল্লাহ কুন বললেই সৃষ্টি হয়ে যায় সে মহান আল্লাহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তারা নানা মাখলুকের গুরুত্ব ও গুনকীর্তন করছে। তারা জানেনা মহা মহাবিস্ফোরণ বা বিগ বেন কিছুই স্বয়ংকৃয়ভাবে ঘটতে পারেনা। তারা

আপাত দৃষ্টিতে যা দেখতে পায় তা মহান আল্লাহরই কুদরতের নিদর্শন। জ্ঞানপাপী অন্ধরা অন্ধের হাতী দেখার মতো বিষয়গুলোকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছে। এর জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ সৃষ্টি নিয়ে ধুম্রজাল তৈরীকারী বা অপব্যাখ্যাকারীদের রুখে দেয়ার জন্য আমাদের কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও এ নিয়ে গবেষণার বিকল্প নেই।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ:

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বলতে বোঝায় যে মহাবিশ্ব সময়ের সাথে সাথে বড় হচ্ছে, যেমন একটি বেলুন ফোলানোর সময় এর পৃষ্ঠের বিন্দুগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে একটি অতি ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই সম্প্রসারণের গতি কমছে কিন্তু এটি কেন ঘটছে তার কারণ এখনও অজানা।মানুষের সীমীত জ্ঞান মহান আল্লাহর হেকমতের কাছে আটকে যায়। যখন তারা ঘোর অন্ধকারে হাবুডুবু খায় তখন পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের লোকেরা বলে এটাই আল্লাহর ক্ষমতা আর গোমরা লোকেরা বলে এটা প্রকৃতির খেলা। তাদের দৃষ্টি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছায়না। তারাই অন্ধ, তারাই নির্বোধ।

সুরা আয যারিয়াত এর ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন-

وَ السَّمَآءَ بَنَیۡنٰهَا بِاَیۡىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوۡسِعُوۡنَ -অর্থাৎ " আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী"।

বস্তু ও প্রাণের উদ্ভব:

মহা বিষ্ফোরণের পর সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের শীতল হওয়ার ফলে অতিপারমাণবিক কণা থেকে শুরু করে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ এবং সবশেষে পৃথিবীর মতো গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ঘটে এটা কিছু অদুরদশী বিজ্ঞানীদের ধারণা। এটাই আল্লাহর কারিশমা এটা তারা বুঝেনা। অথচ ঠিক কোন উৎস থেক পৃথিবীতে জীবন বা প্রাণের সূচনা ঘটেছে তা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে- اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ كُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ (সুরা আম্বিয়া আয়াত-৩০)।

অর্থাৎ- যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল*, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি:

মহাবিশ্বের এত দীর্ঘ সময়কে একটি একক বছরের মধ্যে তুলে ধরার জন্য একটি মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করা হয়, যেখানে মহাবিস্ফোরণকে ১লা জানুয়ারি মধ্যরাতের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়।

মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি হলো মহাবিশ্বের ইতিহাসকে সময়ের ফ্রেমে একক বছরের মধ্যে উপস্থাপন করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, মহাজাগতিকভাবে ১লা জানুয়ারি মধ্যরাতে 'বিগ ব্যাং'-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম এবং বর্তমান মুহূর্তকে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাতের ঠিক আগে হিসেবে ধরা হয়। এটি মহাবিশ্বের বিশাল সময়সীমাকে সহজে অনুভব করার একটি উপায়।

এটি মহাবিশ্বের প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছেরের ইতিহাসকে একটি ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে প্রকাশ করে। অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট কার্ল সাগান এই ধারণাটি জনপ্রিয় করেন, যা মহাবিশ্বের বিশাল সময়কালকে মানুষের জন্য বোধগম্য করে তোলে। এই উপমাটিতে, ১লা জানুয়ারির মধ্যরাতে 'বিগ ব্যাং' ঘটে এবং বর্তমান মুহূর্তটি ৩১শে ডিসেম্বরের একদম শেষ মুহূর্তে থাকে। এটি মহাবিশ্বের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন নক্ষত্র ও ছায়াপথ গঠন, সৌরজগতের সৃষ্টি, এবং পৃথিবীতে জীবনের বিবর্তন কোন সময়ে ঘটেছে তা সহজে বুঝতে সাহায্য করে। মহাকাশ, গ্রহ এবং অন্যান্য বস্তু সৃষ্টির পেছনের কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞান গবেষণা করে, আর জ্ঞানীদের জন্য এতে রয়েছে চিন্তার খোরাক। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ঘাটাঘাটি করলে মহান আল্লা্হর মহিমা আর অস্তিত্ব অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের পূর্ণতা : মহান আল্লাহ পাক ইসলাম ধর্মকে সর্বশেষ নবীর হাতে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পূর্নতা দান করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সুরা আল মায়েদার ৩ নং আয়াতে এভাবে বলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ- ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম’ । প্রশ্ন জাগতে পারে আল্লাহ পাক ইতোপূর্বে এতোগুলো কিতাব ও সহীফা কেন নাজিল করলেন বা এগুলোর প্রয়োজনইবা কি ছিল। তিনি তো আদি-অন্ত বর্তমান- ভবিষ্যতের সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাহলে কেনইবা এতোগুলো কিতাব সহীফা নাজিল করলেন এবং কেনই বা তা আবার রহিত করলেন এবং সবশেষে কুরআন নাজিল করলেন। সীমিত জ্ঞানের কারণে আমাদের মধ্যে এ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন আসতেই পারে। উত্তরে এটাই বলা যায় যে, আল্লাহপাক যে সব বিষয়ে জ্ঞান এটা তারই প্রমান। আমাদের সিদ্ধান্ত হয় অতীত অভিজ্ঞতা আর বর্তমান এর অনুমান থেকে । আল্লাহর ফায়সালা হয় সর্বকালীন তথা সামগ্রিক কল্যানমূখী। আল্লাহ পাক বান্দার বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও অবস্থা

সম্পর্কে সম্পুর্ন ওয়াকেবহাল। কিন্ত বান্দা সব সময় তার বর্তমান জরুরত নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বর্তমানের উপর ভিত্তি করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে চায়। আর সৃস্টি লগ্নেই আল্লাহ তার সব বান্দাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি যদিও রুহে আরওয়া জগতে একসাথে তৈরী করে রেখেছিলেন। সে হিসেবে তাদের পর্যায়ক্রমিক সব প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই তার জন্য অগ্রিম সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এবং প্রয়োজন মতো তা নাজিল করেছেন। হযরত আদম(আ) ও হাওয়া(আ) এর সৃষ্টি পরবর্তী গুটি কয়েক বান্দার প্রয়োজীয়তা আর ক্রমবর্ধমান জনগোষ্টির প্রয়োজনীয়তা এক নয়, গুটি কয়েক বান্দার জীবন ব্যবস্থা আর হাজার হাজার বা লক্ষ কোটি বান্দার জীবন ব্যবস্থার নীতি ও ব্যবস্থাপনা এক নয়। সময়ের সাথে যুগের সাথে পরিস্থিতির সাথে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন হয়। তাই সময় ও পরিস্থিতির আলোকে সময় সময় সহীফা ও কিতাব নাজিল হয়েছে। আর আখেরী জামানার উম্মতের জন্য আখেরি কিতার আল কুরআন নাজিল করে এখানে কেয়ামত পর্যন্ত সকল বিষয় সন্নিবেশিত করে ওহীর দরজা রুদ্ধ করা হয়েছে এবং ঘোষনা করা হয়েছে এটাই শেষ উম্মতের জন্য শেষ কিতাব, কিয়ামত পূর্ববতী এ বিশাল সময়ের মধ্যে আর কোন পয়গম্বর আসবেননা আর কোব কিতাবও আসবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে আগত সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয় এভেবে যে, প্রথম থেকেই কুরআন নাজিল করা হলো না কেন? কেন তাওরাত,জাবুর,ইন্জিল এর মতো কিতাব নাজিলের প্রয়োজন হলো। যার জবাব আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের সম সাময়িক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সময় সময় এ কিতাবগুলো নাজিল হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ ধরা যাক আপনার কোন কঠিন রুগ হয়েছে, আপনি একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তার সাহেব আপনার রুগের অবস্থা বিবেচনায় আপনার লক্ষণের ভিত্তিতে আপনার জন্য উপযোক্ত ঔষধটা নির্ধাইরণ করলেন এবং আপনাকে সেবন করতে দিলেন। আপনার রোগ সেরে গেলো। কয়েকদিন পরে আবার একই রোগে আক্রান্ত হয়ে আবার একই চিকিৎসকের নিকট গেলেন। ডাাক্তার সাহেব আপনার লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, রোগ একই কিন্তু পূর্বের ঔষধটি আর দিলেননা বরং তিনি তা পরিবর্তন করে নতুন ঔষধ দিলেন। অবস্থা এবং লক্ষণের প্রেক্ষিতে এখন এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তাই তিনি তাই করলেন। তখন কি আপনি ডাক্তারকে প্রশ্ন করেন কেন আপনি আগের বেলায় এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ দেন নি। অবশ্যই করেন না, কারণ কোন পরিস্থিতিতে কোন ঔষধ দিতে হবে এটা ডাক্তারই ভালো জানেন। তেমনি মহান আল্লাহ তালাই ভালো জানেন কোন সময়ে ও কোন পরিস্থিতিতে কোন নির্দেশনা বা কোন কিতাব তার বান্দার প্রয়োজন সেটাই সময় মতো নাজিল করেছেন। এটা তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয়। পূর্বের কিতাবগুলো ছিল তৎকালীন মানব জাতির সমসাময়িক প্রয়োজনের নিরিখে আল্লাহ তায়ালার সময় উপযোগী নির্দেশনা। আর কুরআন হলো তার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ সর্বশেষ

ও পূণাঙ্গ গাইডলাইন যার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে সর্বকালের ও সর্ব বিষয়ে এক পূর্নাঙ্গ নির্দেশনা ,যার মধ্যে অন্তভুক্ত রয়েছে অতীতের সকল বিষয়সহ বর্তমান ও অনন্ত ভবিষ্যতের সকল নির্দেশনা। কুরআনের উপস্থিতিতে আর কোন কিতাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। আজ হতে সুদীর্ঘ কাল পূর্বে আমরা কূপি বাতি জালিয়ে যেমন ঘর আলোকিত করতাম, আজ ঝলমলে ১০০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক লাইট জালানোর পর কি আর সেই কুপি বাতি জালানোর দরকার হয় ? অবশ্যই না, আমরা কি বলতে পারবো যে কুপি বাতি বলতে কিছুই ছিল না। ছিল তবে আজ আর তার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তেমনি আমরা স্বীকার করি অতীতে আল্লাহ আসমানী কিতাবসমূহ ছিল কিন্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের পর আর সে কিতাবগুলো অনুসরণ করার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, সেগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কোন সুযোগ নেই কিন্তু এগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় আজ আর নেই।

বিষয়টা যদি অন্যভাবে একটু ব্যখ্যা করি , ধরুন একজন স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটি বা মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র কোন ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। ইতোমধ্যে যেকোন কারণে পাঠ্যক্রমের বইগুলো পরিবর্তন করে ও নতুন সিলেবাস প্রনয়ন করে নির্দেশ জারী করা হলো যে, আগের সিলেবাস ও বই আর বহাল নেই। নতুন পাঠ্যক্রম এর বই থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু ঐ ছাত্র এতে কর্ণপাত না করে পুরাতন বই থেকেই পুরোদমে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলেন। তিনি কি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার কোন সম্ভাবনা আছে? আর তিনি যা করেছেন তা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ ? না , তিনি নিশ্চিত বিফল হবেন শুধুমাত্র তার এ দায়িত্বহীনতার কারণে। আজ যারা শয়তানের প্ররোচনায় কুরআন থেকে দুরে আছেন তারাও আখেরাতে নিশ্চিত বিফল হবেন , নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যে ক্ষতি পুষানোর কোন সুযোগ নেই।অনন্ত কালের জন্য তার জন্য থাকবে শুধু অবর্নণীয় কষ্ট আর অনুশোচনা।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ও সে মোতাবেক আমল করা :

আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা, তার নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারাহ-এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

وَ اِذۡ قَالَ رَبُّکَ لِلۡمَلٰٓئِکَۃِ اِنِّیۡ جَاعِلٌ فِی الۡاَرۡضِ خَلِیۡفَۃً ؕ قَالُوۡۤا اَتَجۡعَلُ فِیۡهَا مَنۡ یُّفۡسِدُ فِیۡهَا وَ یَسۡفِکُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ ؕ قَالَ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

-অর্থাৎ আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি , তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ

পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে অত্যন্ত সম্মানীত করে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করছেন। মানুষ জাতির জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে। একবার ভেবে দেখুন, যদি কোন রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষে আপনাকে প্রতিনিধি হিসেবে কোথাও নিযুক্ত করা হয় তাহলে আপনি আপনাকে কতটুকু সম্মানীইনা মনে করবেন আর দায়িত্ব পালনে কতটুকুই না আন্তরিক হবেন। আপনি আপনার নিয়োগকর্তার আদেশ পালনে সময় , শ্রম এমনকি জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। আর এ মহাবিশ্বের মহান অধিপতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেব নিযুক্ত করেছেন। আপনি কতই না ভাগ্যবান, আপনার দায়িত্ব কতইনা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আপনাকে দিয়েই দুনিয়ায় তার আইন প্রতিষ্ঠা করাতে চান, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে পরিবার , সমাজ, রাষ্ট্রসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দেয়া বিধান চালু করতে চান। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে , তাঁর বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে হিসেবে সময়, শ্রম, জীবন তথা আপনার সর্বোচ্চ এমনকি প্রয়োজনে সর্বস্ব কোরবানীর মাধ্যমে আপনাকে দুনিয়ার বুকে আল্লার চাওয়া মতে তার বিধান চালু করার সর্বাত্নক প্রচেষ্ঠা চালাতে হবে। আর এ কুরবানির পুরস্কার হিসেব আল্লাহ আপনার জন্য রেখেছেন জান্না - অনন্তকালের সুখ শান্তি। আর কর্তব্য পালনে গাফিলতির জন্য রেখেছেন কঠোর জবাবদিহীতা।

আত্নিক পরিশুদ্ধি: মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের জন্য আত্নিক পরিশুদ্ধি একটি অপরিহার্য উপাদান। আত্নিক পরিশুদ্ধি ছাড়া সব আমলই বৃথা। মানসিক ও আত্নিক পরিশুদ্ধি ছাড়া অনেক আমল করে ও অনেক আলেম, অনেক দানবীর , অনেক নামাজি , অনেক হাজী এমনকি অনেক শহীদও জান্নাত লাভ করতে পারবেনা কেবলমাত্র সহীহ নিয়ত ও পরিশুদ্ধ আত্নার অভাবে।

কুরআন হচ্ছে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির প্রধান ও একমাত্র হাতিয়ার, যা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এটি মানুষকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে, নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করতে এবং আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি অর্জনে প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী ভুমিকা রাখে। কুরআন পাঠ, ধ্যান ও গবেষণার মাধ্যমে লব্দ জ্ঞান এর আলোকে জীবন পরিচলনার মাধ্যমে আত্নার পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়।

কুরআন মানুষকে তার রুহের (আত্মা) যত্ন নিতে এবং একে কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে উৎসাহিত করে। এটি আল্লাহর সাথে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং ইহাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তির মূল উৎস।

ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার সঠিক দিশা লাভ:

ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার সঠিক দিশা পেতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা, সততা ও নৈতিকতার পথ অবলম্বন করা এবং হতাশ না হয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি। এ গুণগুলো অর্জনে একমাত্র উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলা।

কোরআন ও হাদিসে সততাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সততা শুধু কথায় বা বাহ্যিক কাজে কর্মেই নয়, বরং চিন্তা, বিশ্বাস, এবং আত্মার গভীরে ইহা স্থাপিত হওয়া উচিত। সততা এমন একটি গুণ যা ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতিকে উন্নত ও সুশৃঙ্খল করে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"

— (সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সত্যবাদিতা শুধু একটি গুণ নয় বরং তা আল্লাহর নৈকট্য মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সততা অবলম্বন করতে এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ অসৎ ও মিথ্যাবাদীদের ঘৃণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ لَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।"

— (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৭)

ভারসাম্য রক্ষা:

কুরআন জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে এবং বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি পরিহার করতে শেখায়। এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশনা দেয় । নীচে এ বিষয়ে একটু সবিস্তার ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি:

কুরআন মানুষকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মাহ হিসেবে তৈরি করেছে, যাতে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং অন্যান্য জাতির ওপর সাক্ষী হতে পারে।ইসলাম কৃপণতা বা অপচয় কোনোটিকেই সমর্থন করে না, বরং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের ওপর জোর দেয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ-এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত, যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) মানুষ সম্পর্কে সাক্ষী হতে পার (বাকারা : ১৪৩)।

শুধু আর্থিক লেনদেনেই নয় শারীরিক ও মানসিক দিকগুলো যেন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় সেজন্য ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন জরুরি। এটি শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক সুস্থতা নিশ্চিত করে। কুরআন বলে যে আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না । এখাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। তেমনিভাবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা যেমন দানের ক্ষেত্রে নিজের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে অবহেলা না করে দান-সদকা করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে। এটি কেবল মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যই নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা নির্দেশ করে। মোটকথা কুরআন মানুষের জীবনেক একটি তথা ভারসাম্যপূর্ন জীবন হিসেবে গড়ে তুলার নির্দেশ দেয়।

হতাশ না হওয়া:

কুরআন মানুষকে হতাশ না হওয়ার কথা বলে এবং এই বিষয়ে অনেক আয়াত ও নির্দেশনা প্রদান করে। হতাশ না হওয়ার মূল বিষয়গুলো হলো- আল্লাহর উপর ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এ বলা হয়েছে-

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ- حَسْبُهُ " অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" (সুরা তালাক:৩)। বারবার ব্যর্থতার পর হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে বলা হয়েছে। হতাশা ও দুঃখ না করতে আল্লাহপাক তার বান্দাকে কুরআন বলেন- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ '' আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে'' ।

তাঁর বান্দাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলার জন্য পবিত্র কুরআনে এভাবেই বলেন- وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

অর্থাৎ-''কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তার রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি'' ।

(সূরা তাওবা: আয়াত-৫৯)। মানুষকে হতাশা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এভাবে তার বান্দাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এটা মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণারই নিদর্শন। আল্লাহ যে বান্দার সর্বোত্তম অভিভাবক এখান থেকেই তা সহজে অনুমেয়।

হতাশা হচ্ছে শয়তানের একটি শক্তিশালী চক্রান্ত যা মানুষকে আল্লাহর রহমতের কথা ভুলিয়ে দিতে চায়। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণে জোর তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তার বান্দাকে হতাশা-নৈরাশ্য ত্যাগ করে আল্লাহর উপর পূর্ন ভরসা রেখে জীবন চলার দীক্ষা পবিত্র কুরআনে বার বার দিয়েছেন যাতে সে শয়তানের কবলে না পড়ে প্রকৃত অর্থে একটি মানবীয় ও স্বার্থক জীবন লাভ করতে পারে।

দায়িত্ব পালন:

কুরআন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র দায়িত্বশীল আচরণ করার উপর জোর দিয়েছে। পরিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণ নিশ্চিত করাসহ জীবনের সকল স্থরে দায়িত্বশীল হিসেবে মানুষকে গড়ে তুলার জন্য কুরআন হচ্ছে একটি প্রশিক্ষণশালা। এ কুরআনই মানুষকে গড়ে তুলে সত্যিকার অর্থে স্বার্থক একজন পারিবারিক কর্তা, সামাজের অধিপতি ও রাষ্ট্রের একনিষ্ট শাসনকর্তা।

পরিবারকে প্রশান্তি ও সৌহার্দ্যের স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল ভুমিকা রাখতে শিখিয়েছে কুরআন। সন্তানদের লালন-পালন,তাদের আদব-কায়দা, শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্ববোধ শেখানো হয়েছে কুরআনে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের একে অপরের প্রতি কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে তাও বর্ণনা করেছে কুরআন।

আপনি যদি একজন পেশাজীবি হন কর্মক্ষেত্রে আপনার পেশাগত দিক নিয়ে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করার তাগিত দিয়েছে পবিত্র কুরআন। এ মর্মে আল্লাহর রাসুলের হাদিস হচ্ছে -طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ 'ইলম বা জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। আপনি যদি একজন কৃষক হন তাহলে আপনাকে জানতে হবে আপনাকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে ও অন্যের হক নষ্ট না করে আপনার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে । ঠিক তেমনি আপনি যদি একজন ব্যবসায়ি হন তাহলেও আপনাকে জানতে হবে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে লেনদেন করতে হবে। ঠিক তেমনি হতে পারেন আপনি অন্য যেকোন পেশার লোক তাতেও আপনাকে জানতে হবে আল্লাহর নির্দেশনা। আপনার উপর যাদের হক্ক বর্তায় তাদের হক যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কারো হক কোনভাবেই নষ্ট করা যাবেনা। আল্লাহপাক কুরআনে বলেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থ: "আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি"। আর ইবাদত মানে শুধু নামাজ, রুজা, হজ্জ আর জাকাতইনা আমাদের প্রতিটি কাজই হতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। আর সে পন্থা হচ্ছে আল্লা্হর কুরআন। কুরআনের নির্দেশনামতে আমাদেরকে হক্ক আদায় করতে হবে আল্লা্হর প্রতি , সাথেসাথে তাঁর মাখলুকের প্রতি। আল্লাহর হক হলো এমন হক যা কেবল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সর্ম্পকিত হককে হাক্কুল ইবাদ বলে। যেমন- পিতা-মাতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, প্রতিবেশীর হক্ক, আত্নীয় স্বজনের হক্ক ইত্যাদি। প্রতিটি হক্ক আপনাকে কুরআনের নির্দেশনা মতে পালন করতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রে আপনাকে হতে হবে কুরআনমূখী ও প্রতিটি কাজ হতে হবে কুরআন ভিত্তিক। তাহলেই আপনার প্রতিটি কাজ হবে ইবাদত। অন্যথায়, প্রতিটি দায়িত্ব ও জিম্মাদারিত্বের জন্য আপনাকে পাকড়াও হতে হবে। তাই কুরআনই হচ্ছে জীবন চলার একমাত্র গাইড লাইন। আর কুরআনের নির্দেশিত পথে চলার পরও অনেক পরীক্ষার মুখোমুখী আপনাকে হতে হবে , তখনো কি করণীয় সে বিষয়েই আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ চান তাঁর প্রিয় বান্দারা সু সময়ে- দু:সময়ে যেন তাঁরই অনুগত থাকে , তাঁরই কাছে সাহায্য চায়। যখন জীবনে বিভ্রান্তি বা হতাশা আসে তখন মনে রাখতে হবে যে ফায়সালা শুধু আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে যেকোনো সময় অন্ধকার থেকে আলোকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আবার আলোকে অন্ধকার করে দিতে পারেন । সব কিছু যেহেতু আল্লাহরই হাতে আর সমাধান এর একমাত্র উপায় যেহেতু হাতে সুতরাং তাঁর নির্দেশনা তথা কুরআনকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

জ্ঞান অর্জন:

কুরআন জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে । এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় এবং এতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।। আর জ্ঞানের জগতের সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান হলো আল কুরআন। মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে আল্লাহ হিকমাহ দান করেছেন এবং জ্ঞান চর্চার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ অর্থাৎ- '' তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে''। আর জ্ঞান অর্জনের তাগিদটা এভাবে আসছে কুরআনের নাজিলকৃত প্রথম আয়াতের মাধ্যমে-اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থাৎ -''পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন''। আল্লাহ স্বয়ং মহাজ্ঞানী , তাঁর দেয়া আল কুরআন হচ্ছে মহা জ্ঞানের আঁধার , তাই কুরআন চর্চাই হচ্ছে সর্বোত্তম জ্ঞান চর্চা।

যাঁরা জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন। যেমন কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন" (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-১১)। যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ, তারা সমান হতে পারে না। কুরআন প্রশ্ন করে, "বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা যুমার, আয়াত-৯) ।

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁরা, যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বিধান অনুসরণ করে এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। ইসলাম শেখা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে । জ্ঞান অর্জনকে একটি ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এর মাধ্যমে সঠিক উপায়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং মানুষকে সঠিক পথে আহ্বান করা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, আল্লাহ তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। তাই জ্ঞান অন্বেষণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনযাপন করলে একজন মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য কুরআনের গবেষণা ও সঠিক জ্ঞান অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়।

৬) পারিবারিক জীবন পরিচালনার বিশেষ জ্ঞান অর্জন:

পারিবারিক জীবন পরিচালনার জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, যেমন ঈমান, তাওহীদ, ও আখলাক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এরপর, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব, এবং সম্মানজনক আচরণের ওপর জোর দিতে হবে, যা ইসলামিক পারিবারিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করে তোলে। একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী পরিবার গঠনের জন্য ধৈর্য ধরে যোগাযোগ, পরিশ্রম এবং দায়িত্ব পালনের মনোভাব থাকা অপরিহার্য। একজন ব্যক্তি

তার নিজের বিষয়ে জবাবদিহিতার সাথে সাথে তার পরিবার বা আহাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সে বিবেচনায় পরিবার ও আহালের বিষয়ে কুরআনের সঠিক জ্ঞান ছাড়া যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন অসম্ভব।
তাই এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা কি তা জানতে আবশ্যিকভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

ঈমান, তাওহীদ, এবং ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন নিজের জীবনের জন্য যেমন দরকারী তেমনি পরিবারের অন্য লোকজন যেমন -স্ত্রী সন্তান বা নিজের দায়িত্বাধীন অন্য লোকদের সঠিক পরিচালনার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন অতীব জরুরী। উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে নিজে যেমন আমল করা যাবেনা তেমনি অন্যদেরও এ বিষয়ে তাগিদ বা শিক্ষা দেয়া যাবেনা। আর পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে অন্যরা আপনার দ্বারা প্রভাবিতও হবে না এবং আপনার আদেশ নিষেধ মান্য করতে মনোযোগী হবে না। তাই মনে রাখতে হবে জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই নের্তৃত্বের মূল হাতিয়ার। সেদিকটি মাথায় রেখে নিজের ও আহালের সঠিক পরিচালনার বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আর এ জ্ঞান রয়েছে পবিত্র কুরআনে।

(চ) সামাজিক জীবন পরিচালনার জ্ঞান অর্জন:

সামাজিক জীবন সাবলীল ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এর জন্য সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য ও আদর্শ মাধ্যম হচ্ছে কুরআন।সামাজিক জীবন হচ্ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারক জীবন সহ পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয় সমেত এক বৃহত্তর অধ্যায়। এখানে রয়েছে ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও আনুষংগিক অনেক বিষয়ের সমাহার। আর এ বৃহত্তর বিষয়টি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। আর সে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও আল্লাহপাক সরাসরি নির্দেশনাসহ অতীত অনেক ঘটনার উদাহরণসমেত আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন যাতে আমরা অতীব অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক দিশা লাভ করতে পারি। যেমনটা আমরা দেখতে পারি পবিত্র কুরআনের সুরা লুকমানে আয়াত নং ১৩ তে আল্লাহপাক উল্লেখ করেন -
يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থঃ ''হে আমার প্রিয় বতস্য ! তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচাইতে বড় জুলুম (অত্যাচার)। তেমনিভাবে সুরা কাসাসের ৩নং আয়াতে বলেন-
نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থ আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে।
তেমনিভাবে সুরা নামলে পিপিলিকার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন-
حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থ- ''অবশেষে যখন তারা পিপড়ার উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল, 'ওহে পিপড়ার দল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ কর। সুলাইমান

ও তার বাহিনী তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে পিষ্ট করে মারতে না পারে''। হযরত সুলায়মান(আ) এর বাহিনীর পদপিষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য পিপড়ার সর্দার কিভাবে তাদের রক্ষা করেছিল তা একটি ইতিহাস হিসেবে মানবজাতির জন্য আল্লাহপাক কুরআনে বর্ণান করে উপযুক্ত নেতার গুনাবলীর নিদর্শন ও গুণাবলী এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এখান থেকে যাতে মানব সম্প্রদায় যুগে যুগে শিক্ষা নিতে পারে।
এছাড়াও রাণী বিলকিসের ঘটনা, হুদ হুদ পাখীর ঘটনা,সুরা কাসাসে মুসা (আ) এর জীবন কাহিনী এগুলো নিছক ঘটনাই না , এগুলো আমাদের জন্য একটি অভিজ্ঞার নজির আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন কুরআনে।
লুকমান (রহ.) তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভের এর উৎকৃষ্ট উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দৃষ্টান্ত মানবজাতির জন্য এক পথনির্দেশনাও বটে। তিনি এমন উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে মানুষের পরকালীন জীবনের মতো পার্থিব জীবনও সুন্দর হয়।
তাছাড়া, কুরআনে পিতা মাতার হক্ক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,আল্লাহ বলেন- وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ অর্থাৎ ''আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে।'(সুরা:লুকমান,আয়াত:১৪)
আবার আল্লাহর হক্ক এর এর বিষয়ে কোন আপোষ নাই সে কথাও স্পস্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। সুরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ -' তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে। এখানে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে। তাই মানুষ কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয়ে মানুষের আনুগত্য করবে না। আবার আনুগত্য পরিহারের সময় এমন আচরণ করবে না যা পার্থিব শিষ্টাচার ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সুরা লুকমানের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ইরশাদ হচ্ছে , 'হে ছেলে! নামাজ কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। এটাই দৃঢ়সংকল্পের কাজ। এ দ্বারা মানুষের করনীয় বা খেলাফতির দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে। সব কিছুর মতো মানুষকে ব্যক্তিগত শিস্টাচারটুকৃ শেখাতে বাদ দেন নাই। এ বিষয়ে আল্লা্হ বলেন- وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - وَ اقْصِدْ فِیْ مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ-

ইরশাদ হচ্ছে-, 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে গাধার সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।' (সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৮-১৯) এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যার মূল কথা জীবনে বিনয়ী ও নম্র হওয়া। আর মুমিন যখন আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

ব্যক্তিগত জীবন বলুন আর সামাজিক জীবন বলুন সব ক্ষেত্রেই জ্ঞান অর্জন অতীব জরুরী। ইসলামে ঈমান ও আল্লাহভীতিসহ মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। কুরআন মানুষকে সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা' করতে উৎসাহিত করে এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করে' (সূরা আল- মায়িদাহ, আয়াত-২)। মানবজীবনেরএমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে আল্লাহপাকের নির্দেশনা নেই। তাই প্রতিটি বিষয়ে আমাদেরকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে কুরআনের দিকে। এ জ্ঞান সমাজ উন্নয়নের যেমন হাতিয়ার, আখেরাতের মুক্তির জন্য সঠিক মাধ্যম। এখান থেকে অর্জিত জ্ঞান আর শাণিত মস্তিষ্ক ব্যবহার করেই জীবনের জটিল সমস্যাগুলো সহজ ও সুন্দর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

কুরআন মানুষকে সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা' করতে উৎসাহিত করে এবং 'পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করে' (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২)।

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের (বা কোনো মানুষের) অভাব পূরণে সাহায্য করে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে সাহায্য করেন, যেমনটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে।

কুরআন সুন্দর আচরণ, সত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং ধোঁকা না দেওয়ার মতো বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়, যা সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করে।

ইসলাম একটি সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায় যা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। এতে যাকাত, সাদাকা এবং অন্যান্য সামাজিক অর্থায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কুরআনের লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে সুস্থ ও সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে সাথেসাথে জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়।

ব্যক্তিগত বিকাশে কুরআন পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এখানে বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং কর্মের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি শুধু আধ্যাত্মিক দিক থেকেই নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং চরিত্র গঠনেও সহায়তা করে, যা মানুষকে

একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। কুরআনের শিক্ষা মেনে চললে একজন ব্যক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে।

ছ) রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নিখুঁতভাবে পরিচালনার নীতি শিক্ষা:

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নিখুঁতভাবে পরিচালনার ইসলামী নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সকল স্তরে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ) বাস্তবায়ন করা। এর মধ্যে আরও রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, শান্তি-নিরাপত্তা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক ও স্বাধীন রাখা। মানবের কল্যানে একমাত্র আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে শরিয়াভিত্তিক শাসন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বলেন আর জ্ঞানহীনতার জন্যই বলেন আজকার এ শরিয়া আইনকে শাসন চালনার নীতি হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছেনা। সারা বিশ্বব্যাপী আজ তাগুদী প্ররোচনায় শরিয়া আইনের বিরোধীতাই করা হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ৯৫% ভাগ মুসলামানের দেশ আমার বাংলাদেশেও শরিয়া আইনকে বাস্তবায়ন তো করা হচ্ছেনা বরং এ আইনে যথাযথ সম্মান বা স্বীকৃতিটুকুও দেয়া হচ্ছেনা। ওলী আউলিয়ার দেশ হিসেবে পরিচয় দিয়ে আমরা নিজেকে সম্মানীত বোধ করলেও এবং কুরআন সুন্নার প্রতি আমাদের দরদ থাকলেও আমরা আজ কুরআনের ও সুন্নার নির্দেশনা থেকে আমাদেরকে অনেক দুরে সরিয়ে রেখেছি। কুরআন আর হাদিসকে যেন আজ আমরা করুণা করেই এগুলোর তারিফ করি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত কোথাও এর বাস্তবায়ন করছিনা। এর মতো হতভাগা আর এ দুনিয়ায় কে হতে পারে? কুড়িয়ে পাওয়া হীরার টুকরা কেউ না চিনে লোহা ভেবে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু যে হীরের টুকরা চিনলো আর সেটা দূরে নিক্ষেপ করে দিলো সেকি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ? কুরআন হাদীসকে চেনার পরও আমরা জীবনে এর বাস্তবায়ন করলাম না, একে জীবন থেকে দুরে সরিয়ে রাখলাম- সে বিবেচনায় আমরা কি সুস্থ মানুষের কাতারে গন্য হবো? এ প্রশ্নটা বিবেককে রাখতে পারি। আমরা যদি আল্লাহর হুকুম তথা কুরআনের নির্দেশনা মতে জীবন তথা পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র চালাতে ব্যর্থ হই কিংবা চেষ্টাটুকুই করিনা তাহলে আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে । আর যদি নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজে বিরুধীতা করি বা বিরত থাকি তাহলে আমাদের জন্য পরকালে কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে।

শরিয়াহভিত্তিক শাসনের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর বিধান মেনে চলা। এই শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখা। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো নামাজ ও যাকাত প্রতিষ্ঠা করা, নৈতিকতা রক্ষা করা এবং ন্যায় ও কল্যাণকর সমাজ গঠন করা।

আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর বিধানই হবে সকল আইনের উৎস। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হবে ইসলামী শরীয়ত, যা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। ।

কুরআন অনুযায়ী, 'আদল' (ন্যায়বিচার) এবং 'ইহসান' (কল্যাণ) হলো ইসলামের দুটি মৌলিক নীতি, যা আল্লাহর নির্দেশ। আদল বা ন্যায়বিচার বলতে সঠিক প্রাপ্য অধিকার দেওয়া এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব না করা বোঝায়, যেমন ওজন ও পরিমাপে কম না দেওয়া। ইহসান বা কল্যাণ হলো সদাচার, সদয় ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করা।

আদল একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমতা এবং সঠিকভাবে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা।এটি কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন - বিচার কার্য,পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং লেনদেনের মতো সব বিষয়েই প্রযোজ্য।

কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা ওজন করো ন্যায়ের সঙ্গে এবং মাপে কম দিও না" (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৯)।

আদল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয় এবং এটি আল্লাহর অন্যতম চাওয়া। আর ইহসান বলতে সদাচার, সদয় ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করা বোঝায়। এটি আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে একজন ব্যক্তি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন সে আল্লাহকে দেখছে।এটি 'আদল' এর চেয়েও উচ্চতর একটি ধারণা, যা সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডকে নির্দেশ করে। আন-নাহল (আয়াত: ৯০) অনুসারে, আল্লাহ ন্যায়বিচার (আদল), কল্যাণ (ইহসান) এবং আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেছেন। আদল ও ইহসান একে অপরের পরিপূরক। আদল হলো একটি নূ্যনতম মানদণ্ড, যেখানে প্রতিটি অধিকার সঠিকভাবে প্রদান করা হয়, আর ইহসান হলো সেই অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উত্তম ও কল্যাণকর পন্থার অনুসরণ। শাসকের প্রধান কাজ হলো সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। শরিয়া আইনের আরো একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এ নীতি প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআন অনুযায়ী, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে "শ্রেষ্ঠ উম্মত" হিসেবে অভিহিত করেছেন, যাদের প্রধান কাজ হলো মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং তারা এই কাজের মাধ্যমে সফল হবে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কুরআনের ভাষায় "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১০)।

প্রত্যেক বান্দাকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যার সামর্থ্য যত বেশি, তার উপর এই দায়িত্ব তত বেশি।যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে, তারা আল্লাহর ইবাদতকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।এই দায়িত্ব পালনের জন্য একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে। 'আমর বিল মারুফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার' এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখা শরিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

কুরআন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ এবং সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়। এটি যাকাত, সদকা এবং সুষম সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে উৎসাহিত করে এবং জামাতে নামাজ আদায়ের মতো ইবাদতের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য স্থাপন করে। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, যদিও তাদের যোগ্যতা, সম্পদ এবং ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। কুরআন ঘোষণা করে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, এবং জাতি, বর্ণ, বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই।

জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ধনী-গরীব, বাদশাহ-গোলাম, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাদা-কালো সকলেই একই সারিতে দাঁড়ায়, যা সামাজিক সাম্যের এক জীবন্ত উদাহরণ। কুরআন যাকাত এবং সদকা (দান) প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্ব দেয়।

কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে, সকল মানুষের কাজ করার ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকা উচিত। ইসলামী রাজস্বনীতি ধনী-গরীবের বৈষম্য দূরীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

কুরআন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে জোর দেয়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান সুযোগ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হয়। এটি সম্পদ বন্টনে সমতা, অভাবী ও দুর্বলদের প্রতি সহযোগিতা, এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরির অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কুরআনের মতে, আল্লাহভীতি ছাড়া কোনো মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে জাতি, বর্ণ, গোত্র বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই। সকল মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান এবং প্রত্যেকেই তার মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহই সকল জীবিকার উৎস এবং মানুষকে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন।ন্যায্য মজুরি: প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার এবং ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার রাখে।কুরআন যাকাত, সাদকা এবং অন্যান্য দাতব্য কাজের মাধ্যমে সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বন্টনের নির্দেশনা দেয়।

এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার উপর জোর দেয়, যাতে কেউ যেন চরম দারিদ্র্যের শিকার না হয়। সুযোগের সমতা: রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের

অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সমাজ উন্নয়ন: অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও উন্নত সমাজ গড়া সম্ভব।

সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা এবং সকলের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা ইসলামের নির্দেশ। কুরআন মানবাধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, যেখানে মানুষের জীবন, সম্পদ, বংশ, জ্ঞান এবং ধর্মকে সুরক্ষিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি মানুষের মর্যাদা, সম্মান, এবং স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে এবং নিরাপত্তা, বিশেষ করে দুর্বল ও অক্ষমদের সুরক্ষার কথা বলে। কুরআনে বলা হয়েছে, "ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই"। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং স্থল ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছেন, যা মানুষের মর্যাদা ও সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে। অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জীবনের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। সম্পত্তির মালিকানা, সুরক্ষা এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বংশ এবং সম্মানের নিরাপত্তা: ইসলামে বংশ রক্ষা, ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান অর্জন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই এবং এটি একটি মৌলিক অধিকার।

নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, তারা শত্রু পক্ষের হলেও। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির কর্মের জন্য অন্যজনকে দায়ী করা যাবে না। সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা করা এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিক সবার জন্য অভিন্ন আইন ও নীতি প্রযোজ্য হবে এবং সবাই একই আদালতের অধীনে থাকবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ: দুর্বলের উপর সবলের দাপট প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে। মানুষের সমঅধিকার আর কল্যাণের জন্য আইনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন-''হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই জানেন''। [সূরা নিসা ৪:১৩৫]

বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন রাখা আবশ্যক যাতে তারা প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত থেকে ন্যায় বিচার করতে পারে। কুরআন জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং শাসকদের এটি শোনার নির্দেশ দেয়, কারণ এটি রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি শাসনামলে শাসকরা জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেননি, বরং শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে একে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা

প্রশংসনীয় এবং এটি সত্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জনগণের কথা শোনা এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা। অন্যের গঠনমূলক পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা একটি মহৎ গুণ। এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ইসলামি বিধান অনুযায়ী, শাসকরা জনগণের মতামত উপেক্ষা করেন না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে একে বিশেষ গুরুত্ব দেন।সবার সব বিষয়ে জ্ঞান থাকে না, তাই অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করলে সত্যের নাগাল পাওয়া যায়। মানুষকে স্বাধীনভাবে মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং এর জন্য প্রজ্ঞা ও ধৈর্য প্রয়োজন। রাসূল (সা.) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবিদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জনগণের মতামতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় একে উপেক্ষা না করার উপর জোর দেওয়া হয়। শাসকরা জনগণের কথা শুনবেন এবং শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন।

যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-ও করতেন। কুরআন অনুসারে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো 'ইকামাতে দ্বীন', যার অর্থ হলো আল্লাহর আইন-বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠন করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় ও সুষ্ঠ বণ্টন নিশ্চিত করা, এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সকল নাগরিকের জন্য (মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য) ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। আর এ কাজ সুচারু রুপে করতে একমাত্র আবলম্বন হলো কুরআনের জ্ঞান।

(জ) বিজ্ঞানের গবেষণায় তথ্য ভান্ডার :

কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর প্রতিটি আয়াত হিকমত ও জ্ঞানের আঁধার। বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো কোরআন। কোরআনে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে যা আজকের বিজ্ঞান গবেষকরা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য। বিজ্ঞান হোক, অর্থনীতি হোক বা ইতিহাস হোক, জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা অনুসরণ করার মতো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আল্লাহ তাআলা আমাদের দেননি। কোরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি সবার জন্যই একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান। নিম্নে কোরআনের বয়ানে কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উল্লেখ করা হলো—

প্রতিটি বস্তুর মূল উপাদান পানি : মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে প্রতিটি জীবের কোষের ৯০ শতাংশ পানি দিয়ে গঠিত। অথচ কোরআন ১৪০০ বছর আগেই সে তথ্য আমাদের জানিয়েছে।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 'এবং প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।' (সুরা : আল আম্বিয়া, আয়াত : ৩০)

লোহার আবিষ্কার মাটি থেকে: বিজ্ঞানের ধারণা যে হাজার হাজার বছর আগে মহাকাশ থেকে একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আঘাত হানে, যার কারণে পৃথিবীতে লোহা ছড়িয়ে পড়ে। এ উল্কা

পিন্ড কেন এবং কিভাবেইবা আঘাত হানে এ বিষয়ে কোন ধারণা তাদের নেই। এটি মূলত বান্দার প্রয়োজনে আল্লাহরই এক কর্ম কৌশল। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ' অর্থ- এবং আমি সৃষ্টি করেছি লোহা, যার ভেতর আছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।' (সুরা : আল হাদিদ, আয়াত : ২৫)

আকাশ সুরক্ষিত ছাদ: বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে আকাশ আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্যের যে রশ্মি পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর, আকাশের ওজন স্তর সে ক্ষতিকর রশ্মিকে আটকে দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : এবং আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। (সুরা : আল আম্বিয়া, আয়াত : ৩২)। বিজ্ঞানীরা আজ যাকে ওজন স্থর হিসেবে আবিস্কার করেছেন। এটি হচ্ছে-স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডলের মধ্যে ১৫-৩০ কিমি (মতান্তরে ২০-৫০ কিমি) উচ্চতার মধ্যে ওজন গ্যাসযুক্ত বায়ুস্তর যা সূর্যের তাপ ও অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে, ফলে এই স্তরের তাপমাত্রা খুব বেশি হলেও তা বায়ুমন্ডলীয় তাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।ফলে জীবজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় ।

পাহাড় হলো কীলকস্বরূপ: এই পাহাড়-পর্বত পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছে। যদি পাহাড়-পর্বত না থাকতো তাহলে পৃথিবী এদিক-সেদিক দুলতে শুরু করতো। এর শিকড় আমাদের ধারণার চেয়ে পৃথিবীর অনেক গভীরে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 'আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা আর পাহাড়কে (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক?' (সুরা : আন নাবা, আয়াত : ৬ ও ৭)। বিজ্ঞানীদের মতে- পূর্বে পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল এবং পরে ধীরে ধীরে ঠান্ডা ও সংকুচিত হওয়ার কারণে ভূত্বকের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়, যা পর্বত গঠনের প্রধান কারণ। পর্বত শুধু উপর থেকে দেখা যায় না, বরং এর একটি বিশাল অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকে। পর্বতগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এসব কর্মকান্ড কেন কিভাবে সংঘটিত হয় তা বিজ্ঞানীদের ধারণার বাইরে এবং এটাই আল্লাহর কুদরত এবং তাঁরই সৃষ্টি রহস্য যা তিনি কুরআনে বর্ণনা করে রেখেছেন।

মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান: বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর আগে বিশ্ব এই তথ্য সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ এটি আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন ১৪০০ বছর আগেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ অর্থ : 'আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।' (সুরা : আজ-জারিয়াত, আয়াত : ৪৭)

সূর্য তার কক্ষপথে চলমান: ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবী বিশ্বাস করত যে সূর্য স্থির, গ্রহ এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু এই থিওরি ভুল প্রমাণিত হয়। এখন বিজ্ঞান বলছে সূর্যও তার কক্ষপথে ঘুরছে। অথচ কোরআন বহু আগেই এই থিওরি বলে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।' (সুরা : আল আম্বিয়া, আয়াত : ৩৩)।

ব্যথার রহস্য: ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা আমাদের পুরো শরীরজুড়ে। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, তার আগে বিজ্ঞান বলেছিল যে ব্যথা মস্তিষ্কের মাধ্যমে অনুভূত হয়। এখন এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অথচ কোরআন ১৪০০ বছর আগেই এই থিওরি বলে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 'যখনই তাদের চামড়া জ্বলে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি তাদেরকে তার পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমতাবান প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : আন নিসা, আয়াত : ৫৬)।

অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে আজ বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে ও করছে সবই ১৪০০ বছর আগেই কোরআন আমাদের তার সূত্র দিয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের জন্য এটাও গর্বের বিষয় যে এই কোরআন আমাদের জন্যই নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটিকে মানবজীবনের সম্পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের বলেছেন যে এতে (কোরআনে) চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আজকের বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির একটি বিশ্ব। উন্নত বৈজ্ঞানিক বিকাশের বিশ্ব। যুগ-যুগান্তর ধরে মুসলিমরাই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটিয়েছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে আজ আমরা আমাদের ঐতিহ্য-ইতিহাস ভুলে গিয়েছি যার কারণে অমুসলিমরা এই ময়দানে এগিয়ে এসেছে। অথচ উচিত ছিল আমাদেরকে কোরআন গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটানো। আজ মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা থেকে পিছিয়ে আসার ফলে সে শূন্যস্থান দখল করে সামনে এগিয়ে এসেছে ইহুদি-খ্রিস্টানরা। যার ফলে তারা বিপুল শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সারা বিশ্বকে আজ শাসন করছে। তারা আজ ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিমজাতি সহ পুরো বিশ্বের । অথচ পাশ্চাত্যের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাগ্রসরতার পেছনে রয়েছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিশাল অবদান।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ আল্লাহ আমাদেরই অনুধাবনের জন্য বর্ণনা করেছেন অথচ আমরা সেব্যাপারে বেখবর। কুরআনে বর্ণিত গুরুত্ব কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বিশ্বজগৎ সৃষ্টি : জগৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে বলা হয়, কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগৎ একটি অখণ্ড জড়বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে বিগ-ব্যাং বলা হয়। সেই মহাবিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগৎ, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হয় এবং বিনা বাধায় সর্বত্র সন্তরণ করে চলে। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا, অর্থ- 'কাফেররা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

প্রশ্ন হলো, বিস্ফোরণ ঘটালো কে? সেখানে প্রাণের সঞ্চার হলো কীভাবে? অতঃপর বিশাল সৃষ্টিসমূহ অস্তিত্বে আনলো কে? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর জানেনা । তবে বিশ্বাসীরা কুরআন থেকে জানে যে, সেই সত্তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন।

প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত্ব : মহান আল্লাহ বলেন-,بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -অর্থ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, সে সম্পর্কে কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়' *(আল-বাক্বারা, ২/১১৭)*।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা আগেই বলেছে,وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ 'আমরা জীবন্ত সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

প্রশ্ন হলো, পানি সৃষ্টি করল কে? অতঃপর তার মধ্যে প্রাণশক্তি এনে দিল কে? আল্লাহ বলেন,- وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থ-'আর আল্লাহ পানি থেকে প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ বিচরণ করে পেটে ভর দিয়ে, কেউ বিচরণ করে দুই পায়ে হেঁটে আবার কেউ বিচরণ করে চার পায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান সৃষ্টি করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী' *(আন-নূর, ২৪/৪৫)*।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি : বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি জিনিস জোড়ায় বিদ্যমান। কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য দিয়েছে এভাবে- سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ' অর্থ- মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু, মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন' *(ইয়াসীন, ৩৬/৩৬)*।

মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে : বিজ্ঞানীদের অধুনাকালের আবিষ্কার যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। অথচ মহান আল্লাহ এ তথ্য ১৪০০ বছর পূর্বেই কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে- **وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ** 'আর আমরা হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহাসম্প্রসারণকারী' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৪৭)*।

মহাকাশ বিজ্ঞান : মহান আল্লাহ বলেন,رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ 'দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল সবকিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই' *(আর-রহমান, ৫৫/৬)*। অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের দুটি প্রান্তে উঠে এবং পশ্চিম দিকের দুটি প্রান্তে অস্ত যায়। আল্লাহ আরো বলেন- وَتَرَى الْجِبَالَ, تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ অর্থ- 'তুমি পাহাড়গুলোকে মনে করছ স্থির হয়ে আছে, কিন্তু এগুলো মেঘের মতো চলমান থাকে। এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ, সে সম্পর্কে তিনি জানেন' *(আন-নামল, ২৭/৮৮)*।

সূর্যের নিজস্ব অক্ষ রয়েছে, এটি আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। আল্লাহ বলেন,لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

অর্থ-'সূর্যের জন্য চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের দিনের ওপর অগ্রবর্তী হওয়া সমীচীন নয়। আর প্রত্যেকেই মহাশূন্যের কক্ষপথে সন্তরণ করছে' *(ইয়াসীন, ৩৬/৪০)*।

পদার্থবিজ্ঞান : আজকাল বিজ্ঞানীদের বিচিত্র আবিষ্কার দেখে আমরা কতইনা অভিভুত হই। আসলে আমরা জানিনা এসব আবিষ্কারের মূল মন্ত্র হচ্ছে আল কুরআন। মহান আল্লাহ

বলেন,يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ - فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

অর্থ: 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে, যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর' *(আস-সাজদাহ, ৩২/৫)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- , تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থ:'ফেরেশতারা এবং রূহ তার দিকে উঠে যায় এমন এক দিনে,যা ৫০ হাজার বছরের সমান' *(আল-মা'আরিজ, ৭০/৪)*। অর্থাৎ সময় আপেক্ষিক।

পৃথিবীতে যত লোহা আছে, তার সবই এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। একমাত্র সুপার নোভার বিস্ফোরণে মহাবিশ্বে লোহা সৃষ্টি হয়, যা উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ অর্থ; 'আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলদেরকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৫)*।

ব্ল্যাকহোল (নক্ষত্র যেখানে ধ্বংস হয়) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে কুরআনে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন- فَلَا أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ অর্থ: 'আমি শপথ করছি তারকাসমূহের পতিত হওয়ার স্থানের' *(আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫৬/৭৫)*।

পালসার (যা অতি তীব্র ছিদ্রকারী গামারশ্মি বিচ্ছুরণকারী তারকা) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন -وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ - النَّجْمُ الثَّاقِبُ অর্থ: 'কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো রাতে আত্মপ্রকাশকারী কী? তা হলো উজ্জ্বল তারকা' *(আত্ব-ত্বারেক্ব, ৮৬/১-৩)*।

আগুন জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে গাছের সবুজ পাতা। আল্লাহ বলেন- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, অর্থ: 'তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাকো' *(ইয়াসীন, ৩৬/৮০)*।

বৃষ্টির পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ে মাটির কণাগুলো আয়নিত করে ফেলে, যার কারণে কণাগুলো 'ব্রাউনিয়ান গতি'-এর কারণে স্পন্দন করা শুরু করে। তারপর আয়নিত কণাগুলোর ফাঁকে পানি এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ আকৃষ্ট হয়ে জমা হয় এবং মাটির কণাগুলো ফুলে যায়। আল্লাহ বলেন- وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ অর্থ: 'আর তোমরা যমীন শুষ্ক দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন

সেটি আলোড়িত ও স্ফীত হয় এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে শুরু করে' *(আল-হাজ্জ, ২২/৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ অর্থ: 'আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি। অতঃপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছি' *(ক্বাফ, ৫০/৯)*। অর্থাৎ মেঘের পানিতে মৃত জমিনকে জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে।

সমুদ্রের পানির উপরে ০.১ মিলিমিটার মোটা স্তর থাকে, যাতে বিপুল পরিমাণে জৈব বর্জ্য পদার্থ থাকে যা মৃত শৈবাল এবং প্ল্যাঙ্কটন থেকে তৈরি হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলো ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, লেড শোষণ করে। এই স্তরটি পানি বাষ্প হওয়ার সময় পানির পৃষ্ঠটানের কারণে পানির কণার সাথে মেঘে চলে যায় এবং বৃষ্টির সাথে বিপুল পরিমাণে পড়ে মাটির পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলো সরবরাহ করে।

পানিচক্র ও মহাকাশ বিজ্ঞান : মহান আল্লাহ বলেন- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ অর্থ: 'তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর সেগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মাঝখান থেকে বৃষ্টিবিন্দু নির্গত হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা আক্রান্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ চমক দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার উপক্রম হয়' *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ অর্থ: 'আল্লাহই বাতাস পাঠান, ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি যেভাবে চান এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়। অতঃপর যখন এ বারিধারা তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়' *(আর-রূম, ৩০/৪৮)*।

মেঘ অত্যন্ত ভারী, একটি বড় আকারের মেঘ **১১** লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত ওজন হয়। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ অর্থ: 'তিনিই তোমাদের সামনে প্রদর্শন করান বিজলি, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশঙ্কার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে এবং তিনিই ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন' *(আর-রা'দ, ১৩/১২)*। তিনি আরো বলেন- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থ: 'আর আল্লাহই বায়ুকে স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ ধারণ করে তখন আমরা তাকে কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিত করি অতঃপর তার মাধ্যমে আমরা বারি বর্ষণ

করি তারপর তার মাধ্যমে আমরা সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৭)*।

আকাশ পৃথিবীর জন্য একটি বর্মস্বরূপ যা পৃথিবীকে মহাকাশের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, অর্থ: 'আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা এর নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩২)*। আল্লাহ আরো বলেন-,الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থ : 'তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, আকাশকে বানিয়েছেন ছাদস্বরূপ, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তোমাদের জীবিকা হিসেবে তার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ফল উৎপন্ন করেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না' *(আল-বাক্বারা, ২/২২)*।

সমুদ্রের নিচে আলাদা ঢেউ রয়েছে, যা উপরের ঢেউ থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বলেন-,أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

অর্থ: 'অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরঙ্গ, তার ওপরে আর একটি তরঙ্গ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। যেখানে কোনো মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও প্রায় দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোনো আলো নেই' *(আন-নূর, ২৪/৪০)*।

পানিচক্র নিয়ে আল্লাহ কুরআনে রয়েছে বিশদ আলোচনা। আল্লাহ বলেন-وَالَّذِي نَزَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ অর্থ: 'আর যিনি আসমান থেকে পরিমিত পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে আমরা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি। এভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান করা হবে' *(আয-যুখরুফ, ৪৩/১১)*।

পৃথিবীতে প্রতি বছর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন এবং ঠিক সমপরিমাণ পানি প্রতি বছর বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবী এবং আকাশে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়।

মিষ্টি ও লবণাক্ত দুই সাগরের মাঝে অনতিক্রম্য ব্যবধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- ,مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ অর্থ: 'দুটি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে, যা তারা অতিক্রম করে না' *(আর-রহমান, ৫৫/১৯-২০)*।

জীববিজ্ঞান: বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা নিয়ে পবিত্র কুরআন কথা বলেনি।মূলত: কুরআনই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সূতিকাগার। কেবল জ্ঞানীরাই তা অনুধাবন করতে পারে। চলুন দেখি জীব বিজ্ঞান নিয়ে কুরআনের উপস্থাপনা কিভাবে। কুরআনে মৌমাছি নিয়ে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং এর মধ্যো মানবজাতির জন্য শিক্ষা লুকায়িত রয়েছে। আল্লাহ

বলেন, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অর্থ: 'তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে আর উঁচু স্থানে বাসা তৈরি করো। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পন্থা অবলম্বন করো। অতঃপর তার পেটসমূহ থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে নিদর্শন আছে' *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

গাভী খাবার হজম হবার পর তা রক্তের মাধ্যমে একটি বিশেষ গ্রন্থিতে গিয়ে দুধ তৈরি করে, যা আমরা খেতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ অর্থ '' আর তোমাদের জন্য গবাদিপশুর মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক' *(আন-নাহল, ১৬/৬৬)*।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মানুষের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ জীবনযাপন করে পিপীলিকা। তারা মানুষের মতোই সামাজিক জীবনযাপন করে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। মানুষের জন্য তা অনুস্মরনীয় হিসে‍ে বিষয়টি মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন - حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থ:'এমনকি যখন তারা সবাই পিপীলিকার উপত্যকায় পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকারা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো, যাতে অজান্তেই সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পিশে না ফেলতে পারে!' *(আন-নামল, ২৭/১৮)*।

জীব বিজ্ঞানীদের ভাষায় উদ্ভিদও একটি জীব। আল্লাহ কিন্তু সেই উদ্ভিদ নিয়েও কথা বলতে বাদ দেন নি পবিত্র কুরআনে। উদ্ভিদের পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আছে। আল্লাহ বলেন وَهُوَ الَّذِي, مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অর্থ: 'আর তিনিই এ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সব রকম ফল জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আর-রা'দ, ১৩/৩)*।

গম শীষের ভেতরে রেখে দিলে তা সাধারণ তাপমাত্রায়ও কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয় না। এটি সূরা ইউসূফের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে- قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ অর্থ- বললঃ তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে।

উদ্ভিদের প্রকৃতি ও চাষাবাদ পদ্ধতি নিয়ে ও কুরআন কথা বলে। উঁচু ভূমিতে ফুল ও ফলের বাগান ভালো ফসল দেয়, কারণ উঁচু জমিতে পানি জমে থাকতে পারে না এবং পানির খোঁজে গাছের মূল অনেক গভীর পর্যন্ত যায়, যার কারণে মূল বেশি করে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। তবে শস্য যেমন আলু, গম ইত্যাদি ফসলের জন্য উল্টোটা ভালো, কারণ তাদের ছোট মূল থাকে, যা মাটির উপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়। আল্লাহ বলেন- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থ: 'আর যারা পূর্ণ একাগ্রতা ও অবিচলতার সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোনো উঁচু ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৫)*।

জীব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার হচ্ছে গাছে সবুজ ক্লোরোফিল রয়েছে। এ নিয়ে মহান আল্লাহ বলেন وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا, مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থ 'আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এরপর তা থেকে সবুজ-শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করি, তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের অবনমিত কাঁদি, আঙুর বাগান, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করি, এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তোমরা লক্ষ করো এর ফলের দিকে, যখন তা ফলবান হয় এবং দেখো তার পরিপক্কতা। নিশ্চয়ই এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে' *(আল-আনআম, ৬/৯৯)*।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। মায়ের গর্ভ শিশুর জন্য একটি সুরক্ষিত জায়গা। এটি বাইরের আলো, শব্দ, আঘাত, ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা করে। এটি শিশুর জন্য সঠিক তাপমাত্রা তৈরি করে, পানি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।

মায়ের গর্ভে সন্তান কীভাবে ধাপে ধাপে বড় হয় তার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা কুরআনের আগে অন্য কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিল না। আল্লাহর বাণী ,ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ অর্থ: 'তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে শুক্রকীট হিসেবে রাখি। এরপর সেই শুক্রাণুকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পাঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর

অস্থি-পাঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরূপে। কাজেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত বরকতময় *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৩-১৪)*।

মানবশিশু প্রথমে শুনতে পায়, তারপর দেখতে পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন - إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا অর্থ: 'আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি' *(আদ-দাহর, ৭৬/২)*। অর্থাৎ প্রথমে কান হয়, তারপর চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে।

অধুনা বিজ্ঞানের আবিষ্কার হচছে যে প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ছাপ ভিন্ন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ অর্থ: 'হ্যাঁ, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম' *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/৪)*।

মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের আঙুলের অগ্রভাগে তিনি সূক্ষ্ম কোনো রহস্য রেখেছেন, যা তিনি মানুষের পুনরুত্থানের সময়ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

(ঝ) সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে:

সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে কুরআন আরবি ভাষার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, একে আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে গন্য করা হয় এবং এতে নৈতিক নির্দেশনা, ঐতিহাসিক বর্ণনা ও প্রার্থনার মতো বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বরং একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আঁধার যা আরবি সাহিত্যের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

উইকিপিডিয়া অনুসারে, কুরআন আরবি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত, যা আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এর ভাষাগত মান উন্নত করেছে। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, তোমরা তিন কারণে আরবিকে ভালোবাসো।

কেননা, আমি আরবিভাষী, কোরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এবং জান্নাতিদের ভাষা হবে আরবি। (বুখারি)

কুরআন নৈতিক নির্দেশনা, ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সাহিত্যের একটি নতুন ধারা তৈরি করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর অনেক কবি ও সাহিত্যিক কুরআনের প্রতি তাদের সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এর সাহিত্যিক উৎকর্ষতা তাদের প্রভাবিত করেছে এবং নতুন ধারার সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছে।

ইসলামি সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে সুস্থ ও কল্যাণময় করে তোলার জন্য কুরআন একটি মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কুরআন সাহিত্যকে নতুন পথে চালিত করেছে, যেখানে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মানুষের মনন ও বোধ জাগিয়ে তোলা এবং সত্য ও সুন্দরের সন্ধান দেওয়া সাহিত্যের কাজ। কারণ, যা কিছু সত্য তা-ই সুন্দর। আর সত্য ও সুন্দরের চর্চা এবং অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলামি সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। কারণ ইসলাম অর্থ শান্তি ও সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ। ইসলামি সাহিত্যই পারে মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাতে। হৃদয়ের গভীরে পরম

আনন্দের স্রোতধারা বয়ে দিতে। ইসলামি সাহিত্য কী? এর সংজ্ঞা কী হতে পারে? যে সাহিত্য সত্য ও সুন্দরকে সুকুমারবৃত্তি ও বিশ্বাসদীপ্ত মননশীলতার মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করে তাকে আমরা ইসলামি সাহিত্য বলতে পারি। কিন্তু যখন কোনো লেখক বা সাহিত্যিকের চিন্তা-চেতনার উৎস হয় অসুন্দর ও কদর্যপূর্ণ তখন স্বাভাবিকভাবেই তার কথা ও লেখা পথ হারাবে। পথ ভ্রষ্টতার শিকার হবে। আরও স্পষ্ট করে বললে, তার বোধ-বিশ্বাস যখন ইসলামশূন্য হবে, তখন তার নির্মিত শিল্প-সাহিত্য মানবতার জন্য আশীর্বাদ না হয়ে উল্টো হয়ে উঠবে অভিশাপ। যারা মনে করে, ইসলামে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার পরিধি সীমিত ও সংকুচিত, তাদের এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন। বস্তুত ইসলামে সাহিত্যের আয়তন ও সীমা দিগন্তবিস্তৃত ও সুবিশাল। ইসলাম সমগ্র সাহিত্যজগৎকে কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীলতাকীর্ণ ঘুপচি-গলির আঁধারির পরিবর্তে সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপবৈচিত্র্যময় নিষ্ঠাবিধৌত শুদ্ধাচার ও সুন্দরের ফুলেল পথ দেখিয়েছে। ইসলামের মৌলিকভিত্তি কোরআন ও হাদিস। তাই সাহিত্যসংক্রান্ত যেকোনো কিছুতে এ দুটি অবলম্বন করেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। নিম্নে ইসলামি দৃষ্টিকোণে সাহিত্যচর্চার স্বরূপ, প্রকৃতি-পদ্ধতি ও তাৎপর্য সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত হলো:

কোরআনে কবিতা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ : কোরআনের সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার আগে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া জরুরি। ইতিহাস বর্ণনানুযায়ী পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার সাহিত্যই কবিতা আশ্রয় করে গড়ে ও বেড়ে উঠেছে। আরবি সাহিত্যও ঠিক অনুরূপ। রাসুল (সা.)-এর নবুয়াতপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে আরবে কাব্যধারা ছিল অত্যধিক প্রচলিত; শৈল্পিক ও নান্দনিকতায় ভরপুর। তাই সাহিত্য প্রসঙ্গ বোঝাতে কোরআনে শের বা কবিতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কোরআন মূলত হেদায়েতগ্রন্থ। তবে অন্য বিষয়গুলোও গৌণ ও মৌনভাবে স্থান পেয়েছে এতে। কাব্য বা সাহিত্যও তেমন একটি প্রসঙ্গ। ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাফেররা রাসুল (সা.)-এর ওপর যে কটি বিশেষণ আরোপ করেছিল, তার মধ্যে 'কবি' শব্দটি অন্যতম। মূলত কাফেররা কোরআনকে কবিতা বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিবাদ-প্রত্যুত্তরে 'কবি ও কবিতা' প্রসঙ্গটি বাহ্যত নেতিবাচক বর্ণনাভঙ্গিতে পবিত্র কোরআনুল কারিমে বিবৃত হয়েছে। কোরআনের বর্ণনাশৈলী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ যে কেউ মনে করতে পারে, কাব্যচর্চা কোরআনে অনভিপ্রেত; কিন্তু আদৌ সে রকম নয়।

কাব্য ও সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কী, তা স্বল্পবিস্তারে বিবৃত হয়েছে সুরা আশ-শুআরায়। আশ-শুআরা অর্থ কবিরা, সুরার এ নামকরণের মাধ্যমেই বোঝা যায়, ইসলামে কাব্য ও সাহিত্যের গুরুত্ব কতখানি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, '...বিভ্রান্তরা কবিদের অনুসরণ করে। আপনি কী দেখেন না, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সাধন করে ও আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' (সুরা আশ-শুআরা, আয়াত : ২২৪-২২৭)।

কোরআনে কোনো বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য আগে নেতিবাচক দিক ও পরে ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা হয়। নেতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রসঙ্গটি দেদীপ্যমান করার বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে আয়াতগুলোতে কাফের কবিদের নিন্দা ও মুমিন কবিদের স্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে।

কোরআনের প্রায় সব তাফসিরবিশাদরা একমত যে এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে কাব্যচর্চাকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি। বরং ঈমানদার কবিদের দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের কাব্যচর্চা আরও পরিশীলিত ও বেগবান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারিতে আছে, উপরোক্ত এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান বিন সাবিত, কাব ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ সাহাবি অশ্রুসিক্ত বদনে রাসুল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহতায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু আমরা তো কাব্যচর্চা করি। এখন আমাদের কী উপায় হবে? রাসুল (সা.) বলেন, আয়াতের শেষাংশ তিলাওয়াত করো। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের কাব্যচর্চা যেন সার্থক হয় এবং অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য-আশ্রিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের অন্তর্ভুক্ত।'

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, কোরআনে কাব্যচর্চা নিষেধ করা হয়নি; বরং কাব্যচর্চা যেন অশুভ ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়ে অধিক কল্যাণপ্রসূ ও পুণ্যময় হয়, সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

হাদিসে কবিতা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনার আগে রাসুল (সা.)-এর ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্যমান কেমন ছিল, তা সংক্ষিপ্তরূপে আলোচনা করে নেওয়া সমীচীন। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র ধমনিতে কাব্যপ্রতিভার শোণিতধারা সদা বহমান ছিল। তার মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন যুগধর্মের দাবিতে একজন স্বভাবকবি। মহানবী (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুর পর তার মা আমিনা যে মর্সিয়া বা শোকগাথা রচনা করেন, তা ইতিহাসখ্যাত। পিতৃব্য আবু তালিবের কবিখ্যাতিও ছিল সর্বত্র সুবিদিত।

রাসুল (সা.)-এর শৈশব অতিবাহিত হয় ভাষাপ্রাচুর্য ও সাহিত্যের রসস্নিগ্ধ পরিবেশের আবহে। ফলে নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগেই তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তিনি বিভিন্ন সময় গর্ব করে বলতেন, 'আমি আরবের সর্বোত্তম ভাষাশৈলীর অধিকারী ব্যক্তি।'

তার প্রতিটি বাণীই ছিল অত্যন্ত মাধুর্যভরা ও সাহিত্যপূর্ণ। ওমর (রা.) একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো আমাদের মধ্যেই বড় হলেন; কিন্তু আপনি এত সুন্দর ভাষায় কথা বলেন!' উত্তরে তিনি বলেন, 'এ তো আমার অধিকার। কারণ পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।' ওমর (রা.)-এর মতো অন্য সাহাবিরাও তার সাহিত্যপ্রতিভা ও বাচনভঙ্গির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তবে তার জন্ম কবি পরিবারে হলেও এবং তার ভীষণ কাব্যপ্রীতি থাকলেও আদতে তিনি কবি ছিলেন

না। কারণ কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম কাজে আল্লাহতায়ালা তাকে নিয়োজিত করেছিলেন।

অবশ্য সিরাতের গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) হুনাইনের যুদ্ধে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। আর আয়েশা (রা.) থেকে তিরমিজি শরিফের বরাতে বর্ণিত আছে, তিনি কখনো কখনো বক্তব্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতা দিয়ে উদাহরণ দিতেন।

রুচিশীল কাব্যচর্চা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়; বরং প্রশংসনীয়ও বটে। তবে কাব্য ও সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সামনে রেখে কাব্যচর্চা ও সাহিত্য সাধনা করলে ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে কোনো কোনো কবিতায় প্রকৃত জ্ঞানের কথা রয়েছে।' তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতাও তেমনই সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতো অসুন্দর। আরেক হাদিসে আছে, কবিতা হলো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কথামালা। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ তা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্যের অপলাপ তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

কবি ও কবিতার প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা :কবি ও কবিতার প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। কবিতা ও সাহিত্যের দ্বার অবারিত রাখতে তিনি কবি-সাহাবিদের পুরস্কৃত করতেন। বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। আর্থিক সহযোগিতা করতেন। গণিমতের মালে তাদের জন্য অংশ বরাদ্দ রাখতেন। মাঝেমধ্যে তাদের কাছে কবিতা শুনতে চাইতেন। কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি রাসুল (সা.)-এর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা দেখে আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবি কবিতা আবৃত্তি করে তাকে শোনাতেন।

একবার রাসুল (সা.) দীর্ঘ সফরে বের হলেন। মরুভূমিতে উটের পিঠে বন্ধুর পথ। রাতও হয়ে উঠেছে বেশ। হঠাৎ বলে উঠলেন, হাসসান কোথায়? হাসসান (রা.) এগিয়ে এসে বললেন এই তো আমি, হে আল্লাহর রাসুল! রাসুল (সা.) বললেন, একটা কবিতা শোনাও তো।'

রাসুল (সা.) কবিদের উৎসাহ দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দানেও ছিলেন সদা সচেষ্ট। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে মসজিদ-ই-নববীর ভেতরে শুধু কবিতা পাঠের জন্য আলাদা একটা মিম্বর (মঞ্চ) তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে রাসুল (সা:) কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) কবিতা আবৃত্তি করে মুসলমানদের শোনাতেন। মুসলমানদের গৌরবগাঁথা ও কাফেরদের নিন্দাকাব্য আবৃত্তি করতেন। রাসুল (সা.) কবিদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝেমধ্যে তাদের নাম ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন।

কবি কাব ইবনে জুহাইর (রা.) রাসুল (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তার প্রশংসাজ্ঞাপক কবিতা রচনা করেন 'বানাত সুআদ'। আনন্দিত হয়ে রাসুল (সা.) তাকে নিজের ডোরাকাটা চাদর উপহার দেন। কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে রাসুল (সা.) মদিনার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিও বানিয়েছিলেন।

রাসুল (সা.)-এর পক্ষ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়ে সাহাবিদের মধ্যে যাদের কাব্যপ্রতিভা ও স্পৃহা ছিল, তারা সবাই কবিতাচর্চায় আরও ঐকান্তিক হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

ছিলেন হাসসান ইবনে সাবিত, লাবিদ ইবনে রাবিআহ, কাআব ইবনে জুহাইর, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কাআব ইবনে মালিক, আব্বাস ইবনে মিরদাস, জুহাইর ইবনে জুনাব সুহাইম, আন-নাবিগা ওরফে আবু লায়লা (রা.) প্রমুখ। নারী সাহাবিয়াদের মধ্যে নবীকন্যা ফাতিমা, খানসা (রা.) প্রমুখ। খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে তিনজনই তৎকালীন আরব বিশ্বের কবি-সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

সুন্দর-সুস্থ এবং মার্জিতভাবে ভাষা ও সাহিত্যচর্চা ইসলামের বিধান। সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাসুলের সুন্নাত। রাসুল (সা.)-এর ঐকান্তিকতা ও ভালোবাসা এবং আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার মসৃণ পথ ধরেই কাব্য ও সাহিত্যচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা যে ইসলাম সমর্থন ও প্রতিপালন করে তার একটি জলন্ত প্রমান হলো আমাদের প্রিয় নবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গেলে তাকে কবিতা ও গানে বরন করা হয়। সে গানটি আজও মুসলিম সংস্কৃতি প্রেমীরা চর্চা করে।

গানটি হচ্ছে-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْن -مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ - وَجَبَالشُّكْرُعَلَيْنَا - مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

(জ) সুস্থ ও সুন্দর জীবন বিনির্মাণের ধারনা লাভ:

কুরআন একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে যেমন - উত্তম নৈতিক আচরণ, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করা ইত্যাদি। এটি বিশ্বাস, ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে জীবন যাপনের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি এবং উত্তম জীবন লাভের পথ দেখায়।

কুরআন অনুযায়ী সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপূর্ণতার কথা বলেছেন এবং এ দুটি গুণকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর এবং কোনো জাতির শত্রুতার কারণে ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিচ্যুত না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে চলে, তাদের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই" (সূরা আন-আন'আম, আয়াত ১১৫)। যারা ঈমান এনেছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "হে যারা ইমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোনো জাতির শত্রুতা যেন কখনোই তোমাদের...ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত না করে" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৫)।

সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের জন্য শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২০৮)। আল্লাহ

তাআলা তাঁর রাসুলদের মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করার এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করার কথা বলেছেন। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পুরস্কার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই রয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা আবশ্যক, যেখানে কোনো পক্ষকে ছোট করা উচিত নয়।ন্যায়পরায়ণতা শুধুমাত্র বিচারালয়ের জন্য নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবনেও তা অনুসরণ করা উচিত। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা জরুরি,যাতে কোনো ব্যক্তিই তাদের কাজ বা কথায় নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়। কুরআন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের উপর জোর দেয় এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়।

কুরআন অনুযায়ী, ধৈর্য এবং বিশ্বাস একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এ দুটি গুণই একজন বিশ্বাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন এবং তাদের পুরস্কার অগণিত। ধৈর্য তিন প্রকার যথা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা, ইবাদত ও সৎকাজে ধৈর্য ধারণ করা এবং বিপদে স্থির থাকা। এই গুণগুলো আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস থেকে আসে এবং এগুলোর মাধ্যমে একজন মুমিন তার পুরস্কার সম্পূর্ণরূপে পাবে। ধৈর্য কেবল আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তাই, ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, তাদের পুরস্কার হবে অগণিত এবং পূর্ণাঙ্গ। যদি কেউ শুধু মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার কোনো প্রতিদান নেই।জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষা আসবে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। যখন সব আশা শেষ হয়ে যায় এবং সব কিছু অন্ধকার মনে হয়, তখন আল্লাহ ধৈর্যশীলদের প্রতি শান্তি ও সফলতা নিয়ে আসেন।

অন্যায় ও পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখা হচ্ছে মুমিনের অত্যন্ত জরুরী কাজ। সব পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্ম পালনে কষ্ট স্বীকার করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। যেকোনো বিপদ বা মুসিবতের সময় হউক বা আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দের সময় হউক অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ এ কাজটি অতন্ত চ্যালেন্জিং। বিপদের সময় মানুষ আল্লাহকে স্মরন করে এটা স্বাভাবিক কিন্ত সুখের সময় আল্লাহকে স্মরন রাখা একটি কঠিন পরীক্ষার কাজ। তাছাড়া, কেউ ইচ্ছা করলে যে কোন ভালো কাজ করতে পারে। টাকা কড়ি থাকলে দান খয়রাত করে দিতে পারে, সময় পেলে তাহাজ্জুদ সহ অনেক নফল সালাত আদায় করে নিতে পারে । মানুষের সাথে ভালো আচরন করতে পারে কিন্তু কিছু পরিস্থিতি আসে যখন মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা বা অনেক কঠিন হয় নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখা । কোন পাপ কাজ সামনে আসে তখন শয়তানের কঠোর প্ররোচনা তার সাথে কাজ করে। সাময়িকভাবে তার ভাল মন্দ হীতাহীত জ্ঞান অনেক দুর্বল হয়ে যায়। তখন অনেক ভালো মানুষ ও অনেক খারাপ কাজ করে ফেলে। সুতরাং এ বিষয়ে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন

করতে হবে মুমিনদেরকে । আমাদের পক্ষে ভাল কাজ করা সহজ কিন্তু মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাটা অনেক কঠিন। তাই আমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে । আর এ কাজ তখনই সম্ভব যখন কুরআনের নির্দেশনা মতে পুর্ণ তাকওয়া অবলম্বন করে জীবন চালাবে এবং স্মরণে রাখবে যে আল্লাহ সব পরিস্থিতিতে আমাকে দেখতেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا অর্থ: যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেন (আত-তালাক আয়াত: ২) ।

কুরআন এবং হাদিস অনুসারে শারীরিক সুস্থতা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতের জন্য শারিরীক সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই ইসলামে সুস্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রোগবালইয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে এর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতি জোরালো তাগিদ দেয়া হয়েছে। তেমনি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শরীরের যত্ন নেয়া,পরিমিত আহার ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহারের শক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে সুস্থ থাকা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং শরীরকে সুস্থ ও শক্তিশালী রাখা জরুরি . কারণ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র কাছে বেশি প্রিয়। এ জন্য পরিমিত আহার গ্রহণ, নেশাদ্রব্য পরিহার করা এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক। অসুস্থ হলে আপনি প্রচলিত ঔষধ বা চিকিৎসা গ্রহন করতে পারেন । আল্লাহ তায়ালার দেয়া চিকিৎসা বিধান পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা আছে , সে চিকিৎসা ও গ্রহন করতে পারেন। কারণ কুরআন সব সসম্যার সাথে চিকিৎসাগত সমস্যার সমাধানও বিধান করে । আল্লাহপাক কুরআনে বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ

অর্থ: আমি অবতীর্ণ করি কোরআন, যা মু'মিনদের জন্যে আরোগ্য ও রহমত। (সুরা বনী ইসরাইল: ৮২)

ঝ) পরকালীন মুক্তির সঠিক রাস্তা লাভ:

সফল ও সার্থক মানবজীবন মানে হলো দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত হওয়া। শান্তি ও মুক্তির একমাত্র সহজ, সরল, সঠিক ও নিশ্চিত পথ হলো ইসলাম। এই সফলতা লাভের জন্য অপরিহার্য গুণাবলি বা শর্তগুলো হলো: বিশ্বাস, সৎকর্ম, সত্য সদুপদেশ অনুসরণ, ধৈর্য ও অনুশীলন। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে বলেন-

'وَالْعَصْرِ ۙ ١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ ٢ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ , وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ' অর্থ - ''সময়ের শপথ! মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।' (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১,২ ও ৩)।

‘বিশ্বাস হলো সব কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি, সময় হলো জীবনের মূলধন, সত্য হলো একমাত্র যথাযথ অবলম্বন, ধৈর্য হলো সফলতার সোপান। যাদের মধ্যে এই চারটি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে, তারাই সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে সফল হয়েছে।

বিশ্বাস করা অর্থ সত্য গ্রহণ করা। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মুমিনকে বার বার সঙ্গায়িত করেছেন যাতে বান্দাগন বুঝতে পারে। কোরআন কারিমের ভাষায়, ‘মোমিন (বিশ্বাস) তো আসলে তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।’ (সুরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত: ১৫)। আবার বলছেন- ‘যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, আর তারপর তার ওপর অবিচল থাকে।’ (সুরা-৩২ হা-মিম সাজদা, আয়াত: ৩০)। অন্যত্র আবার এভাবে বলেছেন- ‘আসলে তারাই মোমিন বা প্রকৃত বিশ্বাসী, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।’ (সুরা-৮ আনফাল, আয়াত: ২)। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে সুরা নিসায় বর্ণনা করেন- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا অর্থ- হে নবী! সা.) আপনার রবের কসম! তারা কখনোই মোমিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু আপনি ফয়সালা করে দেন, সে ব্যাপারে তারা মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না; বরং মনেপ্রাণে তা মেনে নেয়।’ (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৬৫)। এ আয়াতটি হচ্ছে মুমিন হিসেবে আমাদের যাচাইয়ের যথার্থ মাপকাঠি। আমাদের জীবনে সবগুলো সমস্যা সমাধানে কি আমরা কুরআন এবং হাদিসের ফায়সালা খুঁজি। যদি এমনটা করি তাহলে বুঝতে হবে আমরা মুমিন হিসেবে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারবো। আর যদি শুধু সুবিধাজনক স্থানে তথা নামাজ রুজা হজ্ব আর যাকাতের মধ্যে আল্লাহর কুরআন আর নবীর সুন্নতকে পালন করি কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত,পারিবারিক ,সামাজিক ,রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বা বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে কুরআনের ফায়সালা মানি না বা চর্চা করিনা তাহলে আমরা মুমিনই না(নাউজুবিল্লাহ) । এমনটা হলে কুরআন এবং হাদিসের প্রতি পূর্ন বিশ্বাসের প্রমান আমরা দিতে পারি নাই। মুখে বলি কুরআন হাদিসই সব কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা প্রদর্শন করি যা কোনভাবেই মুমিনের বৈশিষ্ট নয় বরং তা মুনাফিকের বৈশিষ্ট। মানুষ ঈমানের দাবি সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এ দাবির বিরোধিতা করে। এ দ্বারা কি আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ?

মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, ইমান আনার পর সৎকাজ করা। সৎকাজ ছাড়া শুধু ইমান মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষতির হাত থেকে পরিপূর্ণ রক্ষা করতে পারে না। বিশ্বাসের গুণটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। অবশিষ্ট গুণগুলো সামগ্রিক ক্ষতি অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য একান্ত জরুরি।

তা হচ্ছে সৎকর্ম, সদুপদেশ ও ধৈর্য তথা সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরস্পরকে হক কথা বলার ও হক কাজ তথা ন্যায় কর্ম করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এই সুন্দর সমাজব্যবস্থা যাতে বিনষ্ট না হয়, সে জন্য সমাজের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন থাকতে হবে । অন্তরে পূর্ণ ঈমান লালনের পাশাপাশি সৎকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা সব মোমিন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।'সেই উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। হকের নসিহত করার সঙ্গে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ইমানদারের ও তাদের সমাজের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য তা হলো, সমাজের সব নাগরিক পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। যত দিন এই হকের উপদেশ অব্যাহত থাকবে, তত দিন এসমাজে কল্যাণ ও শান্তি বিরাজমান থাকবে। পরকালীন মুক্তির জন্যও আপনার এ আমলগুলো হবে সফল ও কার্যকরী উসিলা।

ঞ) ইতিহাস-পর্যালোচনা: মহাগ্রন্থ আল কুরআন তো গতিনুগতিক কোন ধর্মীয় গ্রন্থই না। এর বিশালতা ও গভীরতা আমাদের অনুমানেরও বাইরে। আমরা জানি কুরআন নাজিল হয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। এরমানে এই নয় যে এতে শুধু এসময়কার বিষয়গুলোই সন্নিবেশিত হয়েছে বরং দুনিয়ার শুরু থেকে এমনকি দুনিয়া সৃষ্টির আগের ইতিহাসও এতে আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন যাতে পরবর্তীরা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এ ইতিহাসের বর্ণনাকারী স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাই এর বিশালতা বর্ণনা করার অবকাশই রাখেনা। । মহান আল্লাহ বলেন- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, অর্থ- 'আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশস্বরূপ করেছি '(সুরা :বাকারা, আয়াত : ৬৬)। আল্লাহপাক আরো বলেন -

قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٞ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ
هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ

অর্থ - "তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করো এবং দেখো - যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশাবলী।" (সূরা আল-ইমরান : ১৩৭-১৩৮)।

আল্লাহপাক কুরআনে ব্যক্তিগত ঈমান আকীদা, পরিবার -সমাজ, রাষ্ট - বিশ্ব , বিজ্ঞান -দর্শন , রাজনীতি - অর্থনীতি সব বিষয়েই যেমন বর্ণনা ও নির্দেশনা দিয়েছে তেমনি বিগত সূদীর্ঘ ইতিহাস এবং ভবিষ্যত আগাম পরিণতি সবই কুরআনে স্থান পেয়েছে যা কুরআনকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট ও একমাত্র গ্রহনযোগ্য কিতাবের স্থান দিয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানুষের সত্যের পাঠগ্রহণের মাধ্যম। তাই মানুষ ইতিহাসের পাতায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা

গোষ্ঠীর গৌরব-গরিমার চেয়ে সত্যের অনুসন্ধানই বেশি করবে। ইরশাদ হয়েছে, আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি ওহির মাধ্যমে আপনার কাছে এই কোরআন প্রেরণ করে, যদিও তার আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৩)।

ইতিহাস হচ্ছে জীবন চলার পরীক্ষিত কর্মপন্থা ও সঠিক যাত্রার এক নির্ভরযোগ্য নিশানা। এটাকে অবলম্বন করে সহজ ও সুচারুরুপ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই বান্দার সহজ পথ চলার জন্য আল্লাহ কুরআনে ইতিহাসের স্থান দিয়েছেন। যেমন হযরত আদম(আ:) ও হযরত হাওয়া(আ:) এর সৃষ্টি ও তদপরবতী দুনিয়ায় আগমন পর্যন্ত সকল ইতিহাস কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এর পরে হযরত নুহ (আ:) এর সাড়ে নয় শত বছরের জীবনী, তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম, তার কওম কর্তৃক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও এর পরিণতি তথা মহা প্লানব এর ইতিহাস ; হযরত ইব্রাহিম (আ)এর জীবনী ও জীবনের কঠিন পরীক্ষা ও সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস ; হযরত ইউসুফ (আ:) এর জীবনের ইতিহাস; আল্লাহর হাবীব হযরত (সা:) এর জীবনের ইতিহাস ও সাহাবায়ে আযমাইনগনের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষনা ইত্যাদি উম্মতের জন্য পথ চলার সুস্পস্ট দিশা হিসেবে আল্লাহপাক কুরআনে সংকলিত রেখেছেন। এ ইতিহাস নিছক শুনে যওয়ার ইতিহাস নয়- এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ পথে জীবন গড়ার এক সুস্পস্ট নির্দেশনা ও সঠিক পথের দিশা। তাই আমাদেরকে কুরআন থেকে এ ইতিহাসগুলো ঘেটে ঘেটে বের করতে হবে এবং এর আলোকে মহান আল্লাহর দেখানো পথে আমাদেরকে পরিচালিত করতে হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

কুরআন গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর বাণীকে সঠিকভাবে বোঝা এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা। অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে কাজে লাগানো, সৃষ্টিজগতের রহস্য উন্মোচন করা এবং জীবনের সঠিক পথ খুঁজে বের করা হচ্ছে কুরআন গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় এবং আধুনিক জীবনযাপনে এর প্রাসঙ্গিকতা আবিষ্কার করা যায়। কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে গভীর চিন্তাভাবনা এবং সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে এর মূল শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো বোঝাই হচ্ছে কুরআন গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য। কুরআন শুধু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়নি। তেলাওয়াত করে আমরা সওয়াব হাসিল করি সত্য, এটা রহমতময় ও বরকতময় কুরআনের একটি বিশেষ মাহাত্ন কিন্ত মূল মকসুদ হচ্ছে এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন গড়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত মুক্তির পথ খুঁজে নেয়া। আমরা যদি এ থেকে শুধু দুনিয়াবী ফায়দা নেই কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করিনা তাহলে এ মহামূল্যবান রত্ন পেয়েও আমরা উপযুক্ত কদর করলামনা। এটা আমাদের জীবণের চরম ব্যর্থতা।

গবেষণার প্রশ্ন / হাইপোথিসিস : কুরআন গবেষণার জন্য প্রশ্ন সম্ভার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে । যেমন কুরআনের মূল আহবান, বিয়ষভিত্তিক ব্যাখ্যাও নির্দেশনা এবং এর অলৌকিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ দুনিয়া আসমান জমিনসহ সবকিছু সৃষ্টি করে তার একচ্ছত্র রাজত্বের অধীনে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তৈরী করে তার জীবন বিধান হিসেবে মহা সম্মানীত মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছেন। আর আল কুরআন নামক শ্বাসত এই কারিকুলামের অধীনে শিক্ষা -প্রশিক্ষণ নিয়ে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার সঠিক পথ প্রদর্শন করে আমাদের জন্য দুনিয়ায় এক পরীক্ষা ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করে প্রথেমই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেন। এর পরে তাঁর নিজস্ব খেয়ালেই আবার দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আবার জান্নাতে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা থেকেই সেখানে ফিরে যাওয়ার সঠিক পথ প্রদর্শন করে আমাদেরকে জান্নাতের দিকেই ডাকছেন। মহাবিশ্বের মহান অধিপতি চাইলে কোন দিশা না দিয়েই আমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি করতে পারতেন। তখন আমরা অন্ধকারে হাবুডুবু খেতাম আর অনিশ্চয়তা ও অস্বস্থির মধ্যে জীবন পার করতাম। সঠিক পথ প্রদর্শনটা হচ্ছে আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়ারই নিদর্শন। এতো দয়া মায়া আর রহমত প্রাপ্তির পরও বনি আদমের মধ্যে শুকরিয়া আর আনুগত্যের অনেক ঘাটতি রয়েছে যা সত্যিই এক মহা আশ্চর্যের বিষয়। মহান আল্লাহর অত্যন্ত খায়েসের সৃষ্টি হয়েও অত্যন্ত নগন্য ও ক্ষমতাহীন এ মানুষ আজ আল্ল্হর সাথে বিদ্রুহ করে,

কেউ কেউ তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে এবং স্বয়ং তাঁর বাণী কুরআনকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে। অবশ্য যারা এ মূর্খ্যতা করে তা নিতান্তই অজ্ঞতাবশত:, সঠিক জ্ঞানের অভাব আর শয়তানের প্ররোচনায়ই করে থাকে। তারা শয়তানেরই অনুসারী এবং জাহান্নামেরই হবু অধিবাসীই বটে। আর যারা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে ,আল্লাহর সাহায্য চায় ,সঠিক পথের দিশা প্রার্থণা করে তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান আর তাদের জন্য জান্নাতের ঠিকানা তৈরী করেন।

কিছু বিধর্মীর মতে, কুরআন মুহাম্মদ(সা) ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বা তৎকালীন আরব সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফসল, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি। কিছু বিধর্মীর মতে, কুরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য একটি নির্দেশিকা যা অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই কারণে, তারা কুরআনকে একটি ধর্মীয় বা সামাজিক বিভাজনকারী গ্রন্থ হিসেবে দেখে। আসলে তারা অন্ধ , তারা বধির, তারা নির্বোধ। তারা দেখেনা আল্লাহ পাক বলেন - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - অর্থ ''হে হাবীব আমি আপনাকে বিশ্ব-জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি (সূরা আম্বিয়া ১২ আয়াত ১০৭) । যারা চিন্তা ভাবনা করে তারা ঠিকই কুরআনের সঠিক চেহারা দেখতে পায় - কুরআনের আলোতে তাদের অন্তর আলোকিত হয়, তাঁরা সঠিক পথের দিশা পায়। এ পর্যন্ত যারা দুনিয়ায় কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে কেউ কুরআনে কোন নেতিবাচক দিক আবিষ্কার করতে পারেনি। যতই গবেষণা করেছে ততোই কুরআনের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছে এবং হচ্ছে । কুরআন এবং আল্লাহর মাহাত্ন তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু অমুসলিমও কুরআনের গবেষণা করতে গিয়ে এর প্রকৃত ও আলোকিত চেহার আবিষ্কার করতে পেরেছে। কেননা কুরআন নিজেই আলো, যেই এর দিকে চোখ খুলে চায় এর দ্বার তারই চোখ আলোকিত হয়, অন্তর আলোকিত হয়।

ইসলাম নিয়ে গবেষনার পর ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের উক্তি ছিল এভাবে- আল-কুরআন অদ্বিতীয় জীবনবিধান। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি পৃথিবীর সকল জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও প্রতিভাধর ব্যক্তিকে একত্র করে কুরআনি শিক্ষার আলোকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। কারণ শুধু এই শিক্ষাই মানবজাতিকে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। বিখ্যাত খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক বাডল বলেন , কেবল কুরআনই এমন একটি গ্রন্থ, যাতে এক হাজার ৩০০ বছরের ব্যবধানেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের এমন কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নেই, যা আদৌ কোন দিক থেকে কুরআনের সমকক্ষ হতে পারে । কুরআন নিয়ে যত প্রশ্ন এ পর্যন্ত উত্থাপিত হয়েছে জ্ঞানীরা এর উত্তর খুজে পেয়েছে আর যত প্রশ্ন ভবিষ্যতে আসবে তার উত্তরও সে পেয়ে যাবে, কারণ এ কুরআনের মালিক তো চিরন্জিব, সদা জাগ্রত ; সব উত্তরের ব্যবস্থা তিনিই করে দিবেন। আর তিনি তো শুরুতেই বলে রেখেছেন এমনকি মুক্ত চ্যালেন্জ ছুড়ে রেখেছেন দুনিয়াবাসীর প্রতি আজীবনের জন্য এভাবে - ذَٰلِكَ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থ -এটা এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ার সব কিতাবের সাথে এটাই এর ব্যতিক্রম। আল্লাহর বাণী হিসেবে এটাই তার শ্রেষ্ট প্রমান।

কুরআন অনুসরণ না করার কুফল :

এ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি একটি ধারণা পেলাম যে, কুরআন আমাদের জীবনে কি ইতিবাচক ভুমিকা বা প্রভাব রাখে। কুরআন চর্চার মাধ্যমে কিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করা যায়। এখন একটু দেখে নিই কুরআন থেকে দুরে থাকার কারণে কি সমস্যা বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় মানবজাতিকে।

কুরআনের স্পর্শ আমাদেরকে আলোকিত করে, ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি দেয়। ইহা জীবনের অন্ধকার দূরীভূত করে যেমনটা আইয়ামে জাহিলিয়াতকে স্বর্ণ যুগে রুপান্তরিত করেছিল। আর কুরআন থেকে দূরে সরে গেলে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয় ,অশান্তি এবং অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং পরকালে ভোগ করতে হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর লাঞ্চনা যা কোনভাবে আমাদের কাম্য নয়। নিম্নে এ বিষয়ে মোটামুটি একটা আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

কুরআনের আলো থেকে দূরে থাকা এজনমানুষ যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হিংস্র জন্ত জানুয়ারে পূর্ণ গহীন জংগল অতিক্রমকারী পথহারা নি:সঙ্গ পথিকের মতো। নিজের চোখ বিদ্যমান থাকা সত্বেও গহীন অন্ধকারে যেন চোখে দেখেনা , নি:সঙ্গতার কারণে কেউ তাকে সাহায্যও করতে পারেনা। এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে হিংস্রের থাবায়। আর কুরআনের অবলম্বনে যাদের জীবন চালিত তারা যেস নিশ্চিত নিরাপত্তার চাদরে আবৃত। কুরআন নিজেই আলো যা তাকে পথ দেখায়, কুরআন নিজেই বর্ম্ম যা থাকে হিংস্রের খাবা থেকে সুরক্ষা দেয়, কুরআন নিজেই শক্তিশালী অস্ত্র যা তাকে প্রতিরক্ষা দিতে ও শত্রু বিনাশে শতভাগ কার্যকরি ভুমিকা রাখে , কুরআন নিজেই রাহবার যা তাকে নিরাপদে কাংখিত গন্তব্যে পৌঁছায়। তাই ব্যক্তিগত সুরক্ষায় কুরআনই একমাত্র রক্ষা কবচ যার এর বিকল্প নেই।

ব্যক্তিগত পযার্য়ের উর্ধ্বে যদি পারিবারিক নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করেন সেক্ষেত্রেও কুরআনই সর্বোতকৃষ্ট ও একমাত্র অবলম্বন। কুরআন বিহীন পরিবার যেন অশান্তিতে ভরা এক বিরানভূমি, দুনিয়ার বুকে যেন জাহান্নামের এক দৃশ্যমান নজির, যা আমরা আমাদের আশেপাশেই প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি। পারিবারিক বিপর্যয়ের বিভিষিকাময় চিত্র দেখে আমরা শুধু বিস্মিতই হই কিন্তু এর কারণ আমরা খুব কমই অনুধাবন করতে পারি। কুরআনের

ধারেপাশে যারা নেই তারা মনে করে জীবন এমনই নির্মম। আর যারা কুরআন মানে বা স্বীকার করে কিন্তু জীবনে এর চর্চা নেই তারাও ভাবে এটা তাদের নিয়তি , আল্লাহ তাদের কপালে তা-ই রেখেছেন এ বলে সাময়িক প্রবোধ খুঁজে, কিন্তু দুর্গতি থেকে কোনভাবেই রেহাই পায়না। তারা বুঝেনা যে এটা তাদেরই অর্জন, আল্লাহর নির্দেশ মতো জীনব পরিচালনা না করার যথার্থ ফলাফল। আসলে পারিবারিক যত বিপর্যয় বা টানপুড়ন আর মহাদুর্যোগ সবই কুরআন বিহীন জীবন যাপনের ফলশ্রুতি। আমাদের চারপাশে পারিবারিক অশান্তির যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে পারিবারিক কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ,মাদকাসক্তি,সম্পদ বন্টন নিয়ে ঝগড় ও খুন খারাবী, পিতা মাতার অবাধ্যতা, আত্নীয় স্বজনদের সাথে মনোমালিন্য ইত্যাদি। কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন চর্চার মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। মানুষ বিক্ষুব্ধ হয় যখন তার ন্যায্য হক খেকে সে বঞ্চিত হয়। আমরা যদি প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে অন্যের হক আদায়ে সচেষ্ট হই তাহলে অনেক সমস্যা অনায়াসেই সমাধান হয়ে যায়। যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে হক কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে যথা - তার ভরন পোষন দেয়া, তার প্রতি সব সময় ভালো আচরন করা, তাকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা, অসুস্থ হলে তার সেবা করা,তার কোন আর্থিক পাওনা যেমন মোহরানার অর্থসহ অন্য কোন পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করে নেয়াসহ ন্যায্য সব পাওনা ও অধিকার তাকে দেয়া। মোট কথা সে যেন এ কথা না ভাবতে পারে যে তার ন্যা্য্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঠিক তেমনি স্ত্রীকে ও স্বামীর সব হক আদায় করতে হবে যেমন- তাকে উপযুক্ত সম্মান করা, সর্বদা তার প্রতি ভালো আচরন করা ও তার প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া, তার সম্পদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার ঘনিষ্টজন তথা মা বাবা ভাই বোনদের প্রতি ভালো আচরণ করা, ভালো সময় ও কঠিন সময় তাকে সাহস ও সমর্থন যোগিয়ে যাওয়া - এসব বিষয়ে যত্নশীল হলে আর পারিবাবরিক কলহ বা অশান্তির সুযোগই থাকবেনা। আল্লাহপাক কুরআনে বলেন - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অর্থ- '' আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে'' (সুরা রুম আয়াত নং ২১) ।

একইভাবে কুরআনে পরিবারের প্রতিটি মানুষের হক সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করে তা যথাযথভাবে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই আল্লাহর আনুগত্য ও ঈমান আনয়নের পাশাপাশি কুরআনের নির্দেশমতো সকলের হক আদায় করলে পারিবারিক অশান্তি দুরীভুত হবে এটা শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। মনে রাখা উচিত আল্লাহই আমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক। আমরা সব সময় তার পর্যবেক্ষনে রয়েছি। তার দয়া আমাদের উপর অবারিত। আপনি যখন আল্লাহর ঘনিষ্ট বান্দায় পরিনত হবেন তখন আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষার জন্য কিছু বিপদ আপদ দিতে পারেন। যে পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে আপন থেকে আপনতর

করে নিতে চান। এ সময় আমাদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে হবে। এর পরিনামে আল্লাহ রেখেছেন সীমাহীন প্রতিদান। যেমনটা আপনিও আপনার আদরের সন্তানের ক্ষেত্রে করে থাকেন। আপনি তার হাত থেকে তার পছন্দের জিনিসটা মাঝে মধ্যে কেড়ে নিতে বা হাতিয়ে নিতে চান এবং এর বিপরীতে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করতে চান। যখন সে খুশি মনে তা আপনাকে দিয়ে দেয় তখন আপনি জিনিসটা তাকে সাথে সাথে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে আদর করে কুলে তুলে নেন। এ ঘটনা তার প্রতি আপনাকে অনেক দুর্বল করে তুলে ,অনেক সহানুভুশীল করে তুলে। মাঝে মধ্যে আল্লাহপাক তার বান্দার প্রতি অনুরোপ আচরন করেন। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আল্ল্হ তাকে ঘনিষ্ট এবং মায়ার বান্দা হিসেবে গন্য করেন।

আজকাল সামাজিক অশান্তি ও অসংগতি সকলেই শংকিত। মূলত সামাজিক অশান্তিটা হচছে ব্যক্তিগত ও পারিবরিক অশান্তির এক সামষ্টিক রুপ। এ শান্তিগুলোই বেশীর ভাগ সমাজকে প্রভাবিত করে একটা অশান্ত সমাজের জন্ম দেয়। যেমনটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নীতি নৈতিকতা চর্চা না করা, পারিবারিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা , প্রতিবেশী ও আত্নীয় স্বজনের হক্ব আদায় না করা ইত্যাদি সামষ্টিক আকারে সামাজিক ও জাতীয় সমস্যায় রুপান্তরিত হয়ে গোটা জাতিতে বিদপগ্রস্ত করে। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে কুরআনের নির্দেশনা চর্চা শুরু করা পরিবার সমাজ ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে গেলে কোথাও কোন অশান্তি আর অসংলগ্নতা থাকবেনা। এটা কারো ব্যক্তিগত মত নয় বরং এটা কুরআনের ঘোষণা। তিনি বলেন -وَ نَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ وَّ هُدًی وَّ رَحۡمَۃً وَّ بُشۡرٰی لِلۡمُسۡلِمِیۡنَ- অর্থ -আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যা সবকিছুর ব্যাখ্যা, পথনির্দেশনা, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।

তাই বলা যায় আজকে আমাদের এ অশান্তির জন্য একমাত্র দায়ী কুরআন থেকে সরে যাওয়া। সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় করনীয় কি তা জানতে ও সঠিক সামাধান খুঁজে পেতে আপনাকে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত ছুটাছুটির দরকার নেই। এর সহজ সমাধান আপনার হাতের একেবারেই নাগালে, যা হচ্ছে পবিত্র কুরআন। আপনার ঘরে যুগ যুগ ধরে বংশ পরাম্পরায় সংরক্ষিত হয়ে আসছে অত্যন্ত সযত্নে। কিন্তু এটা মুসলমানিত্বের ঝান্ডা হিসেবে এভাবে ঘরের বুক সেলফে সাজিয়ে রাখার জিনিস নয়। এটা নাজিল হয়েছে পড়ার জন্য , বুঝার জন্য, জীবনে বাস্তবায়নের জন্য, জীবন পরিবর্তনের জন্য । তাই চলূন কুরআনটা আজকেই হাতে নেই, অধ্যয়ন করি, বুঝার চেষ্ঠা করি এবং এর আলোকে জীবন ও সমাজ গড়ি, ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ খুঁজি।

উপসংহার:

বিশদ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বা স্পস্টভাবে এ ধারণা জন্মায় যে, কুরাআন হচ্ছে বিশ্ব জগতের সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞান ও তথ্য ভান্ডার। দুনিয়ার সৃষ্টি এবং তারও পূর্বের সব ঘটনাবলী সহ সমসাময়িক সমগ্র বিষয় ও আখেরাত কিয়ামত ও তার পববর্তী অনন্তকালের সকল বিষয় এতে মহান আল্লাহ পাক সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। একজন মানুষের জীবন যাপন ও তার সমগ্র প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন এতে স্থান পেয়েছে তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি প্রাণীর জীবনধারাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এতে দুনিয়ার সকল বিষয়বস্তু তো আলোচিত হয়েছেই সমূদ্রের তলদেশ বা আকাশ -মহাকাশ,চন্দ্র,সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র কোনটাই বাদ যায় নি। শুধু তাই নয় ব্যক্তি জীবন , পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন এর সকল বিষয়সহ অর্থনীতি , সমাজনীতি, রাজনীতি , সমর নীতি সহ হেন বিষয় নাই যা নিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা এখানে দেয়া হয়নি। এটা যেন একটা ঝিনুকের মধ্যে সারা দুনিয়ার সকল নদী সমূদ্র পাহাড় পর্বত আকাশ বাতাস জড়ো করে পুরে দেয়া হয়েছে। এতেই বুঝা যায় ইহা হচ্ছে মহাবিশ্বের মহা বিশ্বয়, সৃষ্টির সর্ব শ্রেষ্ট এক মুজেযা- মহান আল্লাহরই অসীম ক্ষমতার একটি দৃশ্যমান নির্দশন, যা মানব জাতির হাতে আল্লাহপাক করুণা করে তুলে দিয়েছেন। যাতে তাঁর সম্পর্কে মানুষ সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে। আর এ ধারণা লাভ তখনই একমাত্র সম্ভব যখন মানুষ এ নিয়ে গবেষণা করবে- চিন্তা ভাবনা করবে। তখনই তার চক্ষু খুলবে, দৃষ্টি প্রশারিত হবে। তখন সে দেখতে পাবে পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে মুক্তির মহা মন্ত্র। কুরআন ই হচ্ছে একমাত্র রক্ষা কবচ যা ধারন,বাহন ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানবতা পাবে সত্যিকার শান্তি ও মুক্তি। আর সে মুক্তির জন্য আমাদেরক কুরআন জানা, বুঝা আর গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এক কথায় কুরআনই জীবন, কুরআন মুক্তি, কুরআনই সফলতা, কুরআনই শান্তির সুনিশ্চত আলোকিত পথ। এ পথে আমাদের চলতে হবে, কুরআন বুঝতে হবে অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির পথ আমাদেরকেই রচনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুক। আমিন।

–মোহাম্মাদ নুরুল মুত্তাকিন
রোল নং- ২৩০৯০১১০১০৬